বিদায় বর্মা

মানসী মুখোপাধ্যায়

প্রাপ্তিস্থান
বেঙ্গল পাবলিশার্স * কলিকাতা-১২

প্রকাশক
শ্রীকালীকিঙ্কর মিত্র
ইণ্ডিয়ান পাবলিশিং হাউস
২২।১, কর্ণওয়ালিস ষ্ট্রীট,
কলিকাতা।

মূল্য তিন টাকা

মুদ্রাকর
শ্রীকালীকিঙ্কর মিত্র
ইণ্ডিয়ান প্রেস লিমিটেড,
এলাহাবাদ

উৎসর্গ

মৃত্যুর পরপারে

পরমারাধ্য পিতৃদেব ও

পরমারাধ্যা মাতৃদেবীর

পুণ্যস্মৃতির উদ্দেশ্যে-

নিবেদন

বর্মা থেকে হাঁটা পথে ভারতে আসতে অনেক প্রিয় ও অপ্রিয় ঘটনা ঘটে ছিল সেগুলি আমার এই ভ্রমণ কাহিনীতে যথাযথ ভাবেই লিপিবদ্ধ করেছি।

হাঁটা পথে আসতে যে সকল গ্রামের মধ্যে দিয়ে এসেছি সেগুলির নাম, তথাকার স্থানীয় লোক, লঞ্চের সারেং, গাড়ীর চালক ও কুলিদের নিকট হতে সংগ্রহ করেছি। তারা আমায় যা' নাম বলে দিয়েছে আমি এখানে তাই লিখেছি। যদি কোন নাম ভুল লিখে থাকি তবে সে তাদের বলারই ভুল।

হাঁটা পথে আসতে আমরা প্রথম থেকে শেষ পর্য্যন্ত বহু লোকের আন্তরিক সাহায্য পেয়েছি। সত্যি বলতে কি, প্রয়োজন মত তাঁদের এমন সাহায্য না পেলে আমাদের ভারতে ফিরে আসাই হয় ত সম্ভব হত না। সাহায্যদাতাদের মধ্যে অনেকের নাম প্রকাশ করা সম্ভব নয় বলেই করলুম না, আর সে জন্য বাকী যাঁদের নাম প্রকাশ করতে পারা যায় তাঁদেরও করলুম না।

লক্ষ্ণৌ

১৯শে শ্রাবণ, ১৩৫৭।

মানসী মুখোপাধ্যায়

ঋণ-স্বীকার

আমার এই ভ্রমণকাহিনীটি শ্রীযুক্ত অন্নদাশঙ্কর রায় মহাশয়ের নিকট খুব সঙ্কোচের সঙ্গে পাঠিয়েছিলুম। তিনি এটি পড়ে আমায় খুব উৎসাহ দিয়েছিলেন। তাঁর চেষ্টাতেই প্রথম সংখ্যা "**অশনি**" পত্রিকায় এর প্রথম খানিক অংশ প্রকাশিত হয়েছিল। পরে তাঁর কাছ থেকেই ভ্রমণকাহিনীটি বইরূপে প্রকাশ করবার উপদেশ পেয়েছি। তিনি বইটির স্থানে স্থানে ভুল সংশোধন করে দিয়েছেন, নাম নির্ব্বাচন করে দিয়েছেন এবং ভূমিকা লিখে-দিয়েছেন। 'ইণ্ডিয়ান প্রেস' থেকে ছাপাবার পরামর্শ তিনিই দিয়েছেন। তাঁর কাছ থেকে এমন ভাবে উৎসাহ ও সাহায্য না পেলে ভ্রমণকাহিনীটি কোন দিন আত্মপ্রকাশ করত কিনা জানি না। তাঁর এই অকুণ্ঠিত সাহায্যের প্রতি আমি আমার আন্তরিক কৃতজ্ঞতা ও শ্রদ্ধা জানাচ্ছি।

লেখিকা

ভূমিকা

শ্রীমতী মানসী মুখোপাধ্যায়ের এ বইখানি সাধারণ ভ্রমণ কাহিনী নয়, কারণ ভ্রমণ করার উদ্দেশ্য নিয়ে তিনি ও তাঁর স্বামী এবং দুটি কন্যা মান্দালয় থেকে রওনা হননি। জাপানী আক্রমণের মুখে যেসব বিপন্ন ভারতীয় পরিবার বর্মা ত্যাগ করতে বাধ্য হন এঁরাও তাঁদের মধ্যে ছিলেন। এঁদের পথ ছিল আসাম-বর্মা সীমান্তের পথ যে পথে সাধারণতঃ কেউ কখনো যাতায়াত করত না। এই দুর্গম গিরিবর্ত্ম এঁরা পায়ে হেঁটে অতিক্রম করেন। তার আগে ও তার পরে এঁরা পায়ে হেঁটে ট্রেণ, লঞ্চ, নৌকা, গরুর গাড়ী, ডুলি ও লরী ব্যবহার করেন। পথে বহু লোক মারা যায়। এঁরা যে নিরাপদে ভারতে পৌছতে পেরেছিলেন এটা কেবল এঁদের নয় আমাদেরও মহাভাগ্য। নয় তো আমরা এই অপূর্ব্ব ভ্রমণ কাহিনী পড়তে পেতুম না।

লেখিকার বর্ণনাকুশলতা আমাকে মুগ্ধ করেছে। এই কুশলতা এসেছে তাঁর সদা সজাগ দৃষ্টি থেকে। সেই দৃষ্টি এসেছে তাঁর স্বভাবসিদ্ধ প্রকৃতিপ্রীতি থেকে। প্রকৃতির বিচিত্র রূপ

দেখে নিজের দুঃখ কষ্ট ভুলতে পারা এক আধ দিন সম্ভবপর। ইনি কিন্তু দিনের পর দিন রাতের পর রাত প্রকৃতির রূপে তন্ময় হয়েছেন ও সেই কারণে ভগ্নস্বাস্থ্য সত্ত্বেও অগণ্য বাধাবিঘ্ন লঙ্ঘন করতে পেরেছেন। প্রকৃতি যে মানুষকে বাঁচতে সাহায্য করে এ কথা ধ্রুব সত্য। সৌন্দর্য্য যে মানুষের খাদ্য পানীয়ের চেয়ে বড় একথাও পরম সত্য। এ বই পড়তে পড়তে আমারাও আমাদের পারিপার্শ্বিকের কুশ্রীতা ও জীবনের বিস্বাদ ভুলে যাই এবং প্রকৃতির রূপ সরোবরে অবগাহন করে শুচিস্নিগ্ধ হই।

লেখিকার অনুরোধে আমিই এর নামকরণ করেছি। প্রথমে এর নাম ছিল—"ফেলে আসা দিনগুলি।" সেটা বোধ হয় তাঁর মনে ধরে নি।

অন্নদাশঙ্কর রায়

বিদায় বর্মা

২৪শে ফেব্রুয়ারী, ১৯৪২ খৃষ্টাব্দ

সমস্ত মান্দালয় সহরটি নিবিড় অন্ধকারের মধ্যে দাঁড়িয়ে অভাবিত অথচ সুনিশ্চিত বিপদের কল্পনা করে ভয়ে যেন থমথম করছে। শুধু মান্দালয় বা বলি কেন, সমস্ত বর্মা দেশেরই জাপানীদের আক্রমণে এখন ঐরূপ অবস্থা।

উপরোক্ত দিন রাত ন'টার সময়ে একটি ঘোড়ার গাড়ীতে আমাদের নেহাত প্রয়োজনীয় জিনিষগুলি উঠিয়ে দিলুম। তারপর সাজান সংসারটিকে শেষ বারের মত একবার বেশ করে ঘুরে দেখে নিলুম। সব জিনিষই ফেলে যেতে হচ্ছে, কারণ সংবাদ পেয়েছিলুম যে, মাথা পিছু কুড়ি পাউণ্ডের বেশী জিনিষ নাকি সঙ্গে নিয়ে যেতে দেওয়া হবে না।

যথা সময়ে চোখের জল ফেল্‌তে ফেল্‌তে গাড়ীতে এসে উঠলুম। যাত্রী আমরা ছ'জন—আমি, আমার স্বামী মিঃ মুখার্জ্জী, আমার দুটি ছোট ছোট মেয়ে লীনা ও ধীরা,

আত্মীয়দের নিয়ে এক এক স্থানে দল বেঁধে বসে বা শুয়ে আছে। আশ্চর্য্য হলুম যে, এতলোক, কিন্তু একটুও আওয়াজ নেই। ভাবলুম বিপরীত অবস্থা কত শীঘ্র মানুষকে শৃঙ্খলা শিখিয়ে দেয়।

উপস্থিত আমরা "মনুয়া" যাচ্ছি। মনুয়ার গাড়ী মান্দালয় থেকে রওনা হয় সকাল প্রায় আটটার সময়। কিন্তু রাত্রিতে এসে আমাদের প্রতীক্ষমান গাড়ীতে আশ্রয় নিতে হচ্ছে, কারণ, প্রথমতঃ সকালে ট্রেণে ওঠা এক অসম্ভব ব্যাপার, দ্বিতীয়তঃ আগে থাকতে গাড়ীতে স্থান করে রাখার সম্ভাবনা এখন নেই। রাত দশটায় অন্ধকারের মধ্যে দিয়ে টর্চ্চ জ্বেলে শীতে কাঁপতে কাঁপতে নির্দ্দিষ্ট কামরায় গিয়ে উঠলুম।

২৫শে ফেব্রুয়ারী সকাল বেলা। এখনও আমাদের যে কটি বিশিষ্ট বন্ধু এখানে আছেন তাঁরা আমাদের শেষ বিদায় সম্ভাষণ জানাতে এলেন, আর সঙ্গে আনলেন গরম চা।

মান্দালয় থেকে মনুয়ার ট্রেণ ভ্রমণের মধ্যে একমাত্র অসম্ভব ভির ছাড়া বর্ণনা করবার মত উল্লেখযোগ্য এমন কিছুই নেই। বর্মা দেশের এই দিকটায় পূর্ব্বে আমার

আসা হয় নি। ভেবে ছিলুম ট্রেণ থেকেই এই দীর্ঘ রাস্তার চারিপাশে চোখ বুলিয়ে নেব, কিন্তু এই রকম ভিড়ের মধ্যে সে চেষ্টা করা বৃথা।

এই কামরায় বিভিন্ন জাতের লোক রয়েছেন। সবার মুখেই অনিশ্চিত আশঙ্কার ছাপ সুস্পষ্ট। একজন অ্যাংলো ইণ্ডিয়ান পরিবারও আমাদের কামরার মধ্যে রয়েছেন। দেখলুম, এ হেন ভিড়ের মধ্যে বসেই স্ত্রী স্বামীকে পরম পরিতোষ সহকারে খাওয়াচ্ছেন।

বেলা পাঁচটা নাগাত মনুয়ায় পৌঁছিলুম। 'টামু'র রাস্তা দিয়ে ভারতে যেতে হলে এই মনুয়ায় থামতে হয়, যে জন্য পূর্ব্ব হতেই বহুলোক সমাগমে ষ্টেশন থেকে আরম্ভ করে সহরের মধ্য পর্য্যন্ত ভারতীয় যাত্রীতে একেবারে ঠাসা।

মনুয়া পশ্চিম বর্মার চিন্দুইন নদীর তীরে অবস্থিত ছোট্ট সহর। এমনিতেই স্থানটি ধুলিপূর্ণ, বিশেষ পরিষ্কার নয়। এখন অসম্ভব লোক সমাগমে ও নানা প্রকার আবর্জ্জনায় প্রায় নরক তুল্য হয়ে উঠেছে।

মনুয়ায় এসে আমারা আমাদের এক পুরাণ বন্ধু মিঃ সাহার বাড়ী উঠলুম। আমরা এসে পৌঁছবার দু'দিন পরে

আমাদের খুব কাছাকাছি বহু যাত্রীপূর্ণ এক বাড়ীতে কলেরা আরম্ভ হয়ে গেল।

এখানে এসে রায় বাহাদুর হেমেন রায়ের সঙ্গে দেখা হল। শুনলুম তাঁরাও হাঁটা পথে ভারতে যাবেন। আমাদের এখন মন্নুয়া থেকে চিন্দুইন নদীর ওপারে "কালেওয়া" যেতে হবে। গবর্ণমেণ্টের লঞ্চ এসময়ে মন্নুয়া থেকে কালেওয়া সর্ব্বদাই যাওয়া আসা করছে, কিন্তু তা' আমাদের পাওয়ার সম্ভবনা নেই, কারণ গভর্ণমেণ্ট এখন বর্মা দেশবাসী আাংলো ইণ্ডিয়ানদের পারাপার করতে ব্যস্ত। আমাদের সম্বল এখন নৌকা। কয়েক দিন বেশ পরিশ্রম করে একটি নৌকার বন্দোবস্ত করা হল, ভাড়া সাড়ে তিনশো টাকা।

রায় পরিবারের মধ্যে আছেন রায় বাহাদুর রায়, মিসেস্ রায়—যাঁদের আমি মেশোমশাই ও মাসীমা বলে উল্লেখ করব। রায় বাহাদুর রায়ের ছেলে মিঃ রায়। তিন মেয়ে মীনাদেবী, বেবী ও রুবি এবং মীনাদেবীর দুই বছরের মেয়ে কুম্‌কুম্। ঠিক হল রায় পরিবার ও আমরা একত্রে যাবো। লঞ্চে করে মন্নুয়া থেকে কালেওয়া যেতে লাগে চার দিন সে স্থানে নৌকা করে আমরা যাব পনেরো দিনে।

মন্যুয়াতে প্রতিদিন জাপানীরা বর্মা ভাষায় চিঠি ফেলছে, "তোমরা শীঘ্র এস্থান ত্যাগ কর,—থাকা নিরাপদ নয়।" আর বেশীদিন থাকা সুবিধা হবে না ভেবে আমরা দুই পরিবার ২৮শে ফেব্রুয়ারী রাত্রি বেলা জিনিষ পত্র নিয়ে নদীর ধারে গেলুম। নৌকায় যখন জিনিস ওঠান হচ্ছে তখন একটি কুরুঙ্গী কুলি নিজের খুসীতে আমাদের জিনিসগুলি নৌকায় ওঠাতে থাকে। পরে পয়সা দিতে গেলে সে তার বিনিময়ে তাকে আমাদের সঙ্গে নিয়ে যেতে অনুরোধ জানায়। তার ম্লান মুখ আমাদের তার অনুরোধের বিরুদ্ধে প্রতিবাদ করবার ক্ষমতা লোপ করে দিল। এখন থেকে আমরা যাত্রী হলুম সাতজন।

যখন সব জিনিস নৌকায় ওঠান হয়ে গেছে, তখন রায় বাহাদুর রায়ের এক বন্ধুর সঙ্গে দেখা হয়ে গেল। সব শুনে তিনি বললেন যে, তিনি আমাদের লঞ্চে যাবার ব্যবস্থা করে দেবেন, জিনিস নিয়ে আমরা যেন নেমে আসি।

অল্প সময়ের মধ্যেই তিনি আমাদের জন্য "লেডী-ইনার" নামক লঞ্চে নিয়ে গেলেন। লঞ্চে তিনটি কামরা পাওয়া গেল। সে সময়ে আমি এত ক্লান্ত হয়েছিলুম যে লঞ্চে এসেই সোজা কামরায় ঢুকে বিছানায় আশ্রয় নিলুম।

আজ ১লা মার্চ্চ। প্রথমেই লঞ্চের সকলকে কলেরা ইংজেক্‌শান দেওয়া হল। আটটা নাগাত লঞ্চ মনুয়া ত্যাগ করল। যেমন ভূমির উপর তেমনি লঞ্চে অসম্ভব ভিড়, কোথাও তিল ধারণের স্থান নেই। এখানে মানুষ যেন পশুতে পরিণত হয়েছে। ভিড়, হৈ হৈ, আবর্জ্জনা, দুর্গন্ধ সব মিলে লঞ্চ এক বীভৎস রূপ ধারণ করেছে। এই লঞ্চের সঙ্গেই আবার কুলি ভর্ত্তি একটি কুলি বোট বেঁধে দেওয়া হয়েছে।

এ সময়ে লঞ্চ যে স্থান দিয়ে যাচ্ছে তার জলের গভীরতা কম। নদীর বুকে স্থানে স্থানে বালির চড়া উঁকি মারছে। দুধারের তীরও বালির, তারপরে সবুজ গাছের শ্রেণী সূর্য্যের আলোয় হাঁসছে। আমাদের কামরার সঙ্গে লাগান বাথরুমের পরেই ছোট্ট একটু বারাণ্ডা। আমার সমস্ত দিন এই বারাণ্ডায় কেটে যায়। সকালে সূর্য্যের আলোয় রক্ত রাঙ্গা নদী, তার সাদা বালির চড়া তীরে সবুজ রঙ্গের ঢেউ তোলা গাছ, জলের কল্‌ কল্‌ ছল্‌ ছল্‌ শব্দ আমার ভয়চকিত ব্যথাতুর মনে শান্তির প্রলেপ বুলিয়ে দেয়। তেমনি সন্ধ্যাবেলা আধো আলো আধো ছায়ার মধ্যে দিয়ে নদীর তীর থেকে যেন একতাল উজ্জ্বল সোনার মত

চাঁদ উঠে আসে জ্যোৎস্নাখচিত স্নিগ্ধ, শান্ত আকাশের বুকে আর নিবিড় ভাবে আকর্ষণ করে আমার মন।

লঞ্চে বসে আমাদের কয়েকজন পুরাতন বন্ধুর সঙ্গে দেখা হয়ে গেল। সবায়ের মুখই বিষাদমাখা। নূতন করে যাঁর সঙ্গে আলাপ হল তিনি রেঙ্গুনের লক্ষপতি ব্যারিষ্টার মিঃ কাওয়াসজী জাহাঙ্গীর, বৃদ্ধ পার্শী ভদ্রলোক। এঁর সঙ্গে রয়েছেন এঁর স্ত্রী ও দুটি যুবক ভাইপো। ভাইপো দুটিকে আমি বড় ও ছোট মিঃ কাওয়াসজী জাহাঙ্গীর বলে উল্লেখ করব।

বিকাল বেলা শুনলুম কুলি বোটের মধ্যে একটি কুলি মারা গেছে। আমার মন বড় খারাপ হয়ে গেল। কে জানে কোথায় তার বাড়ী, কোথায় তার আত্মীয় স্বজন বসে বসে সাগ্রহে তার ফিরে আসার দিন গুনছে, আর এখানে সে অসহায় অবস্থায় নদীর বুকে প্রাণ হারাল। মৃত দেহ আমাদের সঙ্গে চল্‌ল। খোঁজ নিয়ে জানলুম সন্ধ্যাবেলা লঞ্চ ঘাটে লাগলে পরে তার দাহকার্য্য হবে।

সমস্ত দিন চলার পর সন্ধ্যাবেলা লঞ্চ 'আঁনদাঁও' নামক স্থানে এসে থামল। মৃত দেহের সৎকার প্রথমেই হল।

আমাদের লঞ্চ থেকে নামতে দেওয়া হল না। লঞ্চ সে রাত্রে সেখানেই রয়ে গেল।

আজ ২রা মার্চ্চ। আবার আমাদের যাত্রা সুরু হল। বলতে ভুলে গেছি যে বর্মা ত্যাগ করবার কিছুদিন আগে থেকে আমি রক্ত শূন্যতায় আক্রান্ত হই। এই দিন লঞ্চে আমি বেশ একটু অসুস্থ হয়ে পড়লুম। সবাই ত ভয় পেয়ে গেলেন। সমস্ত দিন অনিচ্ছায় বিছানায় শুয়ে থাকতে হল, শুধু সন্ধ্যাবেলা খানিক ক্ষনের জন্য বাইরে আসার অনুমতি পেলুম। সে দিন সন্ধ্যাবেলা বেশ খানিক পরে লঞ্চ 'টেনদ' নামক এক গ্রামের কাছে এসে থামল।

আজ ৩রা মার্চ্চ। ভোর বেলা লঞ্চ আবার যাত্রা সুরু করল। এবার নদীর যে অংশ দিয়ে লঞ্চ যাচ্ছে তা' অত্যন্ত গভীর ও তার দুপাশে পাথরের খাড়া তীর। সেই পাথরের উপরেও কিন্তু কচি সবুজ ঘাস বাতাসে মাথা নাড়ছে, ঠিক যেন কাঁচ শিশুর মত। এ দুদিন নদীর জলের রং ছিল মেটে মেটে, কিন্তু আজ তার রং যেন সবুজ ও কালোয় মেশানো। এ স্থানে নদীর পরিধিও কম, দুই তীর সুস্পষ্ট দেখা যাচ্ছে।

সমস্ত দিন চলার পর আজ লঞ্চ খুব তাড়াতাড়ি "মিঙ্গইন-

দাঁও” নামক এক গ্রামের কাছে এসে থামল। তখনও সূর্য্য অস্ত যায় নি, তার লাল আলো নদীর বুকে পরশ বুলিয়ে চলেছে। আমি সকাল বেলা মিঃ মুখার্জ্জীর কাছে বিদ্রোহ ঘোষনা করেছিলুম যে আজ সন্ধ্যাবেলা লঞ্চ যেখানে তার যাত্রা শেষ করবে আমি সেখানে নিশ্চয়ই নামব। ভূমির আকর্ষণ যে কত তীব্র তা' তার বুকের উপর বসে অনুমান করা যায় না, যায় তার থেকে বঞ্চিত হলে। সত্যি, এ দুদিন ভূমির স্পর্শের অভাবে যে কি কষ্ট পেয়েছি তা বলে বোঝান যায় না। তার কত কাছ দিয়ে চলেছি, কতবার মনে হয়েছে এই বুঝি লঞ্চ মাটি ছুঁয়ে গেল, কিন্তু সে মরীচিকা প্রায় পর মূহুর্ত্তেই সরে গেছে। এ যেন লুকোচুরি খেলার মত।

এমনি মাটির জন্য বিচ্ছেদ কাতর মন নিয়ে লঞ্চ ঘাটে লাগার সঙ্গে সঙ্গে তীরে নামলুম। দু'হাত ভরে প্রথমে মাটিকে স্পর্শ করলুম। যত তার বুকে নিজেকে ঢেলে দিই ততই যেন আরো নিবিড় করে পাবার বাসনা বেড়ে উঠে। এ যেন মনে হয় রক্তমাংসের মানুষ,—যেন সত্যিই মা। মনে হয় আমার সর্ব্বাঙ্গ দিয়ে তার সর্ব্বাঙ্গের উত্তাপ অনুভব করি, ওরই মধ্যে লীন হয়ে যাই। দুহাত দিয়ে

তাকে নিবিড় করে জড়িয়ে ধরে হেঁসে কেঁদে তার মাঝে ছড়িয়ে পড়ি।

কতক্ষণ একই ভাবে ঘাসের উপর জল কাদার মধ্যে বসে রইলুম। তারপর লঞ্চ থেকে অন্যান্য সঙ্গীরা নেমে এলে পর তাদের সঙ্গে নদীর বুকে গিয়ে পড়লুম। তীরের কাছাকাছি জলের মধ্যে বেশ বড় বড় ঘন সবুজ রঙের ঘাস রয়েছে আর ইতস্ততঃ ছড়িয়ে রয়েছে নানা আকারের ছোট বড় পাথর।

প্রথম ত জলের মধ্যে খানিক ডুবে বসে রইলুম। তারপর আমাদের মধ্যে পাথর ছোঁড়ার প্রতিযোগিতা আরম্ভ হল, অর্থাৎ নদীর মধ্যে কে কতদূর পর্য্যন্ত পাথর ছুঁড়তে পারে।

রোজ রাত্রে খাওয়ার টেব্‌লে বেশ আড্ডা জমে উঠত। আজ খাওয়ার টেব্‌লে বসে গুজব শুনলুম যে, রেঙ্গুন নাকি জাপানীদের করতলগত হয়েছে। খবর শুনে প্রত্যেকেরই মন খারাপ হয়ে গেল। আড্ডা আর জমল না, যা' দু'চার কথা হল সবই দুঃখের।

৪ঠা মার্চ্চ মিঙ্গইনদাঁও থেকে ভোর বেলা রওনা হয়ে লঞ্চের বাইরে প্রাকৃতিক দৃশ্য ও ভেতরের বীভৎসতা

উপভোগ করতে করতে সেই দিনই প্রায় রাত বারোটার সময়ে "কালেওয়াতে" এলুম। সে রাত আমাদের লঞ্চে কাটল।

আজ ৫ই মার্চ্চ। কথা ছিল এ দিনটা আমরা লঞ্চে কাটিয়ে সন্ধ্যেবেলা কালেওয়াতে নামব। কিন্তু ইতিমধ্যে অ্যাংলো ইণ্ডিয়ানদের নিয়ে একটি লঞ্চ এসে উপস্থিত হয়। তাঁরা আমাদের লঞ্চটিও থাকবার জন্য দাবী করেন এবং শুধু সেই কারণে ভোর বেলা আমাদের লঞ্চটি খালি করে দিতে গভর্ণমেণ্ট থেকে বাধ্য করা হয়।

কালেয়া থেকে বাস কিংবা গরুর গাড়ী করে টামু যেতে হয়। নেবে খোঁজ নিয়ে জানা গেল যে বাস ত দূরের কথা গরুর গাড়ীও পাওয়া যাবে না। স্থানীয় লোকেরা নৌকা করে "চিগন" নামক স্থানে যাবার পরামর্শ দিলেন। অগত্যা আমরা আটটি নৌকা ভাড়া করলুম। অবশ্য সেগুলিকে নৌকা না বলে সাম্পান বললেই ভাল হয়। সকাল বেলা নদীর তীরে খিচুড়ী রান্না করে নিয়ে রায় পরিবার, কাওয়াসজী জাহাঙ্গীর পরিবার ও আমরা সেই দিনেই নৌকা করে চিগনের উদ্দেশ্যে রওনা হলুম।

নৌকা করে যেতে যেতে মনে হল নদী এখানে যেন

সম্পূর্ণরূপে বিরাট বিরাট পাহাড়ে বেষ্টিত হয়ে আছে, বেরুবার পথ দেখলুম না। তীরের কাছাকাছি জলের মধ্যেই জেলেরা মাচার উপরে খড়ের ঘর করে আছে। সেই সব ঘরের প্রবেশ দ্বার এত ছোট যে বসে ঢুকতে হয়। নদী এই স্থানে চঞ্চলা বালিকার রূপ ধারণ করেছে। এইরূপ স্থানে অমন দুর্ব্বল ঘরগুলি কেমন করে দাঁড়িয়ে আছে ভেবে ঠিক করে উঠতে পারলুম না।

তখন পূর্ব্বাকাশে আবীরের ছড়াছড়ি। সূর্য্যের লাল আলো পাহাড়গুলির গা বেয়ে মাটি স্পর্শ করে নদার বুকে ছড়িয়ে পরে তাকে করে তুলেছে লালে লাল। নৌকায় বসে বসে প্রকৃতির রূপ দেখছি। সে যে কত সুন্দর কত মনোরম তা' লিখে কি বোঝাব। উপরের ঘন নীল আকাশ থেকে পাহাড়গুলি যেন দু'ভাগ হয়ে নেমে এসেছে মাটির বুকে। প্রথমে পাহাড়. তার কোলে আবার পাহাড়, তার কোলে আবার এমনি ভাবে যেন সবুজ রঙের ভেলভেট মোড়া পাহাড়ের ঢেউ বয়ে গেছে, যেন তার আর শেষ নেই। আবার এই পাহাড়গুলির মধ্য দিয়ে সর্পিল গতিতে এঁকে বেঁকে কল কল স্বরে বয়ে চলেছে নদী। গভীর নিস্তব্ধতা, অপরূপ দৃশ্য, আর নদীর সুমিষ্ট স্বর সব মিলে এ

স্থানে এক পবিত্র আবহাওয়ার সৃষ্টি করেছে। আমি ভুলে গেলুম পেছনে ফেলে আসা সযত্নে গড়া সংসারটির বিরহ ব্যথা।

মাষ্টার মশাই ও মিঃ মুখার্জ্জীর দৃষ্টি প্রকৃতির এই মধুর দৃশ্যের দিকে আকৃষ্ট করলুম তাঁরা উভয়েই উহা প্রকৃতই অপরূপ বলে স্বীকার করলেন। মাষ্টার মশাই জানালেন, "ভ্রমণ জিনিষটি খুব উপকারী.—যেমন মনের দিক দিয়ে, তেমনি জ্ঞানের দিক দিয়ে। আমার মতে প্রত্যেক পুরুষেরই ভ্রমণের সুযোগ পেলে তা' নষ্ট করা উচিত নয়।" আমি বললুম, "প্রত্যেক স্ত্রীলোক সম্বন্ধেও একথা খাটে।" তাতে মাষ্টার মশাই জানালেন; "হাঁ সুযোগ পেলে তাঁরাও করতে পারেন, তবে তাঁদের পক্ষে তেমন প্রয়োজনীয় নয়।" আমাদের মধ্যে এ নিয়ে খানিক তর্ক হল। কিন্তু উভয়ের মতের মধ্যে অত্যন্ত প্রভেদ দেখে উভয়েই চুপ করে গেলুম। মাষ্টার মশায়ের ধারণা দেখলুম অনেক পেছিয়ে আছে। তাঁর কাছে নারীজাতি এখনও কোমলা, অবলা, সরলা।

প্রায় তিন মাইল চিন্দুইন নদীর বুকে চলার পর আমরা একটি পাহাড়ী নদীতে এসে পড়লুম। বহু দূরবর্ত্তী কোন পাহাড় থেকে এটি নেমে এই নদীর বুকে লুটিয়ে পড়ছে।

এটিকে কেন নদী বলা হয় তা' বুঝে উঠতে পারলুম না। আসলে এটি নদী নয়—ঝর্ণা, পাহাড়ের সিঁড়ি বেয়ে নদীর সঙ্গে মিতালি পাতিয়েছে। শুনলুম দৈর্ঘে অনেক বড়, কিন্তু প্রস্থে দেখছি পনেরো ষোল হাতের বেশী কিছুতেই নয়। কিন্তু যাক্‌গে সে কথা, সেজন্য আমার মাথা ব্যথা নেই। আমি ব্যস্ত হয়ে পড়লুম সবুজ পাহাড়ের ফাঁকে ফাঁকে এই চঞ্চলা রূপসিনীর রূপে। কি বলব আমি, কি ভাবে করব এর বর্ণনা? প্রকৃতির ক্রোড়চ্যুতা, সহরের কোঠায় সীমাবদ্ধ স্থানে বন্দিনী আমি এই অতুলনীয় অবর্ণনীয় রূপের মাঝখানে দাঁড়িয়ে বাক্‌হারা হয়ে গেলুম, ভুলে গেলুম নিজের অস্তিত্ব। মন সুধু বলতে লাগল, "একি সত্যি, স্বপ্ন ত নয়।"

এখানে নৌকা দাঁড় টেনে চালান হচ্ছে না। লম্বা শক্ত বাঁশ স্বচ্ছ জলের মধ্যে পাথরের খাঁজে আটকে নৌকাকে উপর দিকে ঠেলে তোলা হচ্ছে।

দুপুরের দিকে যখন বৃষ্টি এলো তখন সে সুন্দরী-রূপসী আর একরূপ ধারণ করল। আকাশ, পাহাড়, ভূমি সব ঝাপসা, সব মিলে মিশে একাকার হয়ে গেল। এতক্ষণ ঝর্ণাটিকে দেখে মনে হচ্ছিল কেউ যেন তার নীচে বসে আগুন দিচ্ছিল

আর উপরে তাই তার জল টগবগিয়ে ফুটছিল। এখন বৃষ্টি তার সাথী হতে সে হয়ে উঠল ভয়ঙ্কর। উপর থেকে পাক খেতে খেতে দুর্ব্বার গতিতে নেমে এসে দু'পাশের পাহাড়ের গায়ে সশব্দে আছড়ে পড়ছে। দেখে মনে হয় এ যেন জল নয়, যেন লক্ষ লক্ষ শিশু কলহাস্যে ছুটে এসে পাহাড়-দের আলিঙ্গন জানাচ্ছে। এই দুর্ব্বার-গতিসম্পন্না ভয়ঙ্কর—রূপিনী ঝর্ণার উপরে আমাদের নৌকাগুলিকে মনে হচ্ছে যেন ঠিক কম্পমান কটি পাতা। প্রতিক্ষণে তাদের দু'পাশ দুলে দুলে নদীকে চুম্বন জানাচ্ছে। মেঘ যে ভাবে সজ্জা করে এসেছিল তাতে ভাবলুম যুদ্ধটা বেশ ভালই জম্‌বে। আসলে বৃষ্টি হল কিন্তু অল্প, অন্ধকারই হল বেশী। সূর্য্যের আলো মাঝে মাঝে মেঘের সেই অন্ধকারময় ঘন পর্দ্দা সরিয়ে পাহাড়, ভূমি ও জলের বুকে হীরার কুচি ছড়িয়ে দিচ্ছিল।

দুর্য্যোগের আভাষ পেয়ে আমি ছাড়া দলের সকলেই নৌকার ভেতর আশ্রয় নিলেন। মাঝিরা বার বার করে সাবধান করছে। যথা সময়ে আমার উপরেও তলব এলো ভেতরে যাবার। মিঃ মুখাজ্জী ভূমিকা আরম্ভ করল, 'যখন জীবন মরণ সমস্যা তখন কি আর কবিতা চলে ? ভেতরে এসো। এমনিই অসুস্থ, আবার বাড়াবাড়ি হবে।' অগত্যা

অত্যন্ত অনিচ্ছায় ছল ছল চোখে ভেতরে এলুম। কিন্তু ভাগ্য সুপ্রসন্ন! খানিক পরেই তাস খেলার লোভ দেখিয়ে আমাদের নৌকায় নৌকা লাগিয়ে রায়েরা মিঃ মুখার্জ্জীকে ডেকে নিলেন। আমি ত বাঁচলুম, খুসী মনে পূর্ব্বের স্থান অধিকার করে প্রকৃতির রূপ-সুধা পানে মনোনিবেশ করলুম।

বৃষ্টি খানিকক্ষণ। আবার সূর্য্যদেব হাসি মুখে এসে দাঁড়ালেন, আর তাঁর আলোর পরশ পেয়ে খুসীতে প্রকৃতি-রাণী ঝলমলিয়ে উঠল।

এই ভাবে চলতে চলতে আমাদের যাত্রা এমন স্থানে এসে থামল যেখানে নৌকা অচল, কারণ জলের গভীরতা অত্যন্ত অল্প, আর তার গতি বেগ ও পাথর খুববেশী। মাঝিরা পরামর্শ দিল যে গ্রাম খুব কাছে, সেখানে চলে যেতে ও পথ দেখিয়ে নিয়ে যাবার জন্য সঙ্গে একটি লোক দিল। আমাদের সঙ্গীরা ও আমার দুটি মেয়ে নিয়ে মিঃ মুখার্জ্জী চলে গেলেন। রইলুম কেবল আমি, নৌকার দোলাণীতে বড় ক্লান্ত হয়ে পড়েছি বলে, আর মাষ্টার মশাই রয়ে গেলেন পরে আমায় নিয়ে যাবার জন্য। কিন্তু মিনিট কয়েক পরে ছোট মিঃ কাওয়াসজী জাহাঙ্গীর ফিরে এলেন

আমাদের ডাকতে। খানিক দূরে নাকি ঝর্ণার দৃশ্যটি ভারী সুন্দর। রূপের সন্ধান পেয়ে আমার ক্লান্তি ছুটি নিল। আমি ও মাষ্টার মশাই তাঁকে অনুসরণ করলুম।

আমি সঙ্গীদের মাঝে এসে ঝর্ণার দিকে চেয়ে হেসে দাঁড়াতেই মেশোমশাই বলে উঠলেন, "কেমন লাগছে মা? বলত এমনটি কি কল্পনা করতে পেরেছিলে?" কল্পনা! কল্পনা করব কোথা থেকে। সেও যে এখানে পরাজয় মানে—অনুভূতি হয়ে যায় স্থির, নিশ্চল।

এখানে ঝর্ণাটি বিস্তৃতি লাভ করেছে। ছোট, বড়, মাঝারি নানা গড়নের নানা রঙের পাথর ছড়ান রয়েছে ঝর্ণার একপ্রান্ত থেকে অপর প্রান্ত পর্য্যন্ত। সেই পাথরের উপর দিয়ে কানে মধু ঢেলে বয়ে চলেছে ঝর্ণার জলের ধারা। দেখে মনে হয় ও যেন জল নয়, যেন গলান বুদ্‌বুদ্‌ময় রূপা, পাক খেতে খেতে ও নানা প্রকার আবর্ত্ত সৃষ্টি করতে করতে চলেছে নদীর বুকে লুটিয়ে পড়তে। মধ্যাহ্ন সূর্য্যের শুভ্র, তীব্র আলো তার উপরে পড়ে যেন মুঠো মুঠো তারা ছরিয়ে দিচ্ছে। এক গভীর মুগ্ধতার মাঝে নিজেকে হারিয়ে ফেললুম। দেখে দেখে যেন আর সাধ মেটে না। মনে হচ্ছে ঝর্ণার ঐ ফেনময় জল ধারার

মধ্যে নেমে যাই, দু'হাত দিয়ে তার স্পর্শ অনুভব করি ও ও বন্দী করি তাকে আমার দুই মুঠায়। দুই পাশে শ্যাম-লতা ঢেলে দিয়ে বয়ে যাওয়া এই ক্ষীণাঙ্গী রূপালী ঝর্ণাটিকে আমায় পিছনে ফেলে যেতে হবে ভেবে মনে যেন কি এক অদ্ভুত ব্যথা অনুভব করতে লাগলুম।

মনের স্ফুর্ত্তি হারিয়ে সন্ধ্যা নাগাত নির্দ্দিষ্ট গ্রামে এসে পৌঁছুলুম। গ্রামটির নাম "চিউইনদন," কালেওয়া থেকে এটি সাত মাইল দূরে। আমরা যেখানে আশ্রয় পেলুম সেটি একটি দরমা নির্ম্মিত বাংলো। বাংলোটি গভর্ণমেণ্টের, কিন্তু একজন বাঙ্গালী ভদ্রলোকের তদারকে আছে বলে তাঁর দয়াতে আমরা এখানে থাকার অনুমতি পেলুম। ভদ্রলোক আরো নানা প্রকারে আমাদের সাহায্য করেন।

তাড়াতাড়ি ঝর্ণার জলে স্নান সেরে রাতের আহার শেষ করলুম। এখন ঘুমের পালা। আমার সঙ্গীরা ঘুমের বুকে হারিয়ে গেলেন, কিন্তু আমার অবস্থা হল বিপরীত। এমনিইত রক্তশূন্যতার জন্য অনেক সাধ্য সাধনায় ঘণ্টা দুয়েকের বেশী রাত্রে আমার ঘুম হয় না, তার উপর আজ আমায় ঝর্ণার রূপ পাগল করেছে। মিঃ মুখার্জ্জীর কাছে সন্ধ্যাবেলা প্রস্তাব করেছিলুম যে, আমি বাহিরের

বারাণ্ডায় শোব। এই দিনে, নতুন জায়গায় বাহিরে শোয়ার প্রস্তাবে সে ত' হেসেই খুন। আমার মন খারাপ হয়ে গেল। ভাবতে লাগলুম কি করা যায়। আজ বোধ হয় দ্বিতীয়া। চাঁদের আলোয় স্নান করে রাতের পৃথিবী এক নূতন রূপ ধারণ করেছে। গাছের পাতায়, মাটির বুকে, জলের স্রোতে সোনার ছড়াছড়ি। রাতের পৃথিবীর সেই-রূপ দেখে, বিশেষ করে ঝর্ণাটির, ঘরের কোণে মনস্থির থাকে কি করে। অগত্যা উপায় খুঁজতে লাগলুম। হটাৎ দেখি ঝর্ণার দিকের দেওয়ালের এক স্থান দিয়ে আমাদের অন্ধকার ঘরে চাঁদের আলো হাসছে, কারণ এস্থানের দরমাটি ফাঁক হয়ে গেছে। সুপ্রসন্ন ভাগ্যকে বহু ধন্যবাদ জানিয়ে সেই স্থানে বিছানাটি টেনে নিয়ে রূপের কাছে আত্মসমর্পণ করলুম। সে রাতে ঘুমের চিন্তায় আমায় বিরক্ত হতে হয় নি।

আজ ৬ই মার্চ্চ। আমাদের চিগন যাবার তাড়া ভোর থেকেই আরম্ভ হয়ে গেছে। এইখানে সকাল দশটার মধ্যে দুপুরে খাওয়া সেরে আমাদের যাত্রা সুরু হবে।

সকাল বেলা ঝর্ণার ধারে বেড়াতে গিয়ে দেখে ছিলুম তার উপর দিকে একস্থানে জল জমে পুকুরের মত হয়ে

গেছে। মৎলব করেছিলুম যে, যাবার আগে এইখানে একবার সাঁতার কাটতে হবে। আমি নতুন সাঁতার কাটতে শিখেছি, তাই অবস্থা অনেকটা বাছুরের নতুন শিং ওঠার মত। সকাল বেলাতেই মিঃ মুখার্জ্জীর কাছে প্রস্তাবটি পেশ করেছিলুম। দেখলুম তার ঘোর আপত্তি, কারণ আমরা আসার কয়েক দিন আগে একটি মাদ্রাজী যুবক এই স্থানে স্নান করতে নেবেছিল; তারপর আর উঠে আসেনি বা তার দেহের কোন সন্ধান এখনও পাওয়া যায় নি। তার আপত্তি দেখে চুপি চুপি কাজ সারব ভেবে লীনাকে নিয়ে নির্দ্দিষ্ট স্থানে গেলুম। এত কাণ্ড করে কিন্তু কৃতকার্য্য হতে পারলুম না। জলের বুকে ঝাঁপিয়ে পড়ার আগেই মিঃ মুখার্জ্জী খবর পেয়ে পাকড়াও করে একেবারে বাংলো নিয়ে এলো। আমার তখনকার অবস্থা বলবার মত নয়।

যথা সময়ে আমাদের চিগনের উদ্দেশ্যে যাত্রা সুরু হল। নৌকা আমাদের নিয়ে স্রোত ও পাথর অতিক্রম করে অগ্রসর হতে পারবে না বলে আমাদের খানিক রাস্তা হাঁটার ব্যবস্থা হল। ঠিক হল নৌকা আমাদের জন্য যথাস্থানে অপেক্ষা করবে। একজন মাঝি আমাদের রাস্তা দেখিয়ে নিয়ে চল্‌ল। প্রথমে খানিক ঝর্ণার ধার দিয়ে

চলার পর আমরা জঙ্গলে প্রবেশ করলুম। এই জঙ্গলে উঁচু নীচু, ছোট বড় নানা আকারের ও নানা রঙের পাথরের উপর দিয়ে আমরা এগিয়ে চল্‌লুম। জঙ্গলের মধ্যে খানিক দূর যাওয়ার পর বহুদূর বিস্তৃত পলাশের বন দেখলুম। ফুলে ফুলে গাছগুলি ভরে আছে। দূর থেকে দেখে মনে হয় যেন কে প্রদীপের মালা দিয়ে গাছগুলিকে অমন করে সাজিয়েছে কোন্ অজানিত অতিথিকে সাদর অভ্যর্থনা জানাবার জন্য। আমি কিছু পলাশ ফুল দিয়ে আমার আঁচল ভরে নিলুম।

ঘণ্টা দুয়েক পরে আমরা আবার নৌকায় উঠে চিগনের দিকে অগ্রসর হলুম। লক্ষ্য করলুম যে, আমরা যত উপরের দিকে যাচ্ছি জলের গভীরতা ততই বৃদ্ধি পাচ্ছে। এখানে ঝর্ণাটিকে নদী বলা চলে। এখন তার না আছে তীব্রগতি, না আছে মনকে নাড়া দেবার মত শক্তি। বালিকা গৃহিণী হয়ে গেছে।

দুপুরে দেখি নদীর ধারে ছোট্ট খড়ের ছাউনির নীচে ভারতগামী বহু যাত্রী ও যাত্রিনী বসে বিশ্রাম ও চা পান করছেন। আমরাও যাত্রা ভঙ্গ করে বৈকালিক জলযোগ সারলুম। তারপর আবার রওনা হয়ে যখন চিগনে পৌঁছ-

লুম তখন প্রায় সন্ধ্যা। এইখানে আমাদের নৌকা যাত্রা শেষ হল। শুনলুম এবার আমাদেব প্রায় একশো-কুড়ি মাইল রাস্তা গো-যানে অতিক্রম করতে হবে।

যেখানে আমরা আসলুম সেখানে নদী থেকে তীর সোজা উপরে উঠে গেছে, কাজেই উপরে ওঠার রাস্তা অত্যন্ত সাংঘাতিক। বহু কষ্টে মাল-পত্র উপরে ওঠান হলে পরে আমরা স্নান সেরে প্রায় হামাগুড়ি দিয়ে উপরে উঠলুম। এখানে ছাউনি রয়েছে। মাটির মধ্যে বাঁশ পুঁতে তার উপরে খড়ের চাল করে দেওয়া হয়েছে ও মাটিতে পাতলা করে খড় পেতে দেওয়া হয়েছে। যাত্রীদের জন্য গভর্ণমেণ্ট থেকে এই ছাউনিগুলি করা হয়েছে। হিমে জলে মাটি ও খড় ভিজে সপ্ সপ্ করছে। তারই উপরে ক্লান্ত দেহ এলিয়ে দিয়ে পর্য্যবেক্ষণের জন্য চারিদিকে দৃষ্টিকে পাঠালুম। কী ভীষণ, কী বীভৎস এ স্থান!

এক বিরাট জনতা ভারতে গমনের উদ্দেশ্যে এ স্থানে জমা হয়েছে। জমা হয় ত হত না, যদি লোক সমাগম অনুযায়ী যানবাহনের ব্যবস্থা থাকত। কিন্তু সে ব্যবস্থা করবে কে? এই দুর্দ্দিনে প্রবাসী ভারতীয়দের অবস্থা পিতৃ-মাতৃহীন শিশুর মত। নানা বয়সের বহু দুর্ব্বল ও অক্ষম

রোগী ও রোগিণী, বহু আসন্ন প্রসবা নারী ও কপর্দ্দকহীন বহু লোক এখানে সাগরের বুকে স্রোতহারা নদীর মত এসে জমা হয়েছে। আর্ত্তের কাৎরাণি, দুঃখীর বিলাপ ও শিশু-দের কান্না ত আছেই তার উপর সুস্থ ব্যক্তির নানারূপ কর্কশ চীৎকারে সে এক কর্ণবিদারক কলকোলাহলের সৃষ্টি হয়েছে।

প্রত্যেকেই ভিন্ন ভিন্ন উনুন জ্বালিয়ে রান্নার ব্যবস্থা করেছেন। এই রকম অসম্ভব ভিড়ের মধ্যে আবার অসংখ্য উনুনের ধোঁয়ায় প্রাণ একেবারে অস্থির। এর উপর আবার নানা প্রকার দৈহিক আবর্জ্জনা ও তীব্র দুর্গন্ধ ত আছেই। কিন্তু সব কিছু ভাবনা ছেড়ে আমার মনে আগুন লাগার চিন্তা বাসা বাঁধল।

আমার চিন্তার সূত্র ছেঁড়ে গেল করুণ চীৎকারে। দেখি আমাদের পাশের ছাউনির নীচে একটি শিখ মহিলা একটি বাচ্চা ছেলেকে নির্দ্দয় ভাবে মারছেন। বড় মন খারাপ হয়ে গেল। মাষ্টার মশাইকে ডেকে বললুম, "বারণ করলে হয় না?" হেসে তিনি উত্তর দিলেন, "পাগল হয়েছেন? বারণ করতে গেলে ওর হাতের ঐ বাঁশটি মাথায় পড়বে। তা'ছাড়া উনি কি আর শুধু শুধু মারছেন, না

ওঁর মাথার ঠিক আছে। নানা জ্বালা ওঁকে অমন করে তুলেছে।" কথাটি ঠিক, এমন অবস্থায় পড়লে ও এমন স্থানে এলে কার আর মাথার ঠিক থাকে। কিন্তু তবু মন সায় দিল না। অবোধ শিশু কি বোঝে, তাকে কষ্ট দিয়ে শান্তি কোথায়?

ব্যথিত মনে আবার আমার পূর্ব্ব চিন্তায় ফিরে এলুম। কিন্তু ভাল লাগছেনা শিশুর এই কাতর আর্ত্তনাদ, তাই উঠে ভিড় ঠেলে আমাদের ছাউনি যেখানে শেষ হয়েছে সেখানে গিয়ে ঙনতার দিকে পিছন হয়ে পাহাড়ী নদীর দিকে ফিরে দাঁড়ালুম।

আকাশে এখন চাঁদ নেই, অগণিত তারার আলো রাত্রির অন্ধকারকে খানিক স্বচ্ছ করেছে মাত্র। পাহাড়ী নদীর অপর পারের পাহাড়গুলিকে অন্ধকারে মনে হচ্ছে যেন কৃষ্ণকায় বিরাট জীবের দল নানা ভঙ্গীতে স্থির ভাবে শুয়ে আছে। আমি যেখানে দাঁড়ায়ে আছি তার কিছু দূরেও একটি পাহাড় রয়েছে। প্রকৃতির এই রহস্যময় রূপের মাঝখানে দাঁড়িয়েও আমার মন কিন্তু শিশুর আর্ত্তনাদ ও যাত্রীদের দুর্দ্দশায় চিন্তার হাত থেকে নিষ্কৃতি পেল না। নানা চিন্তা মনে ভিড় করে দাঁড়াল। "কি

জানি কি হবে, না জানি এরপর আরো কি আছে। যত এগিয়ে চলেছি ততই ত দেখছি যাত্রীদের দুর্দ্দশা বেড়ে চলেছে।” সহসা আমার চিন্তায় বাধা পড়ল। দেখি রাতের অন্ধকার আকাশ হঠাৎ আলোয় উদ্ভাসিত হয়ে উঠেছে। কারণ কি জানবার জন্য ফিরে দেখি আমার কিছু দূরে যে পাহাড়ের কথা আগে বলেছি তাতে আগুন লেগেছে। আগুন কাছে দেখে ছাউনিতে আমাদের নির্দ্দিষ্ট স্থানে ফিরে এলুম ও বসে বসে দেখতে লাগলুম প্রকৃতির আর এক রূপ। মান্দালয় থাকতে অগ্নিবেষ্টিত মেমিওপাহাড় বহুবার দেখেছি, তবে এত কাছে থেকে নয়। আগুন পাহাড়ের পদতল হতে আরম্ভ হয়েছে ও তাকে প্রদক্ষিণ করতে করতে উপরে উঠে গেছে। দূর থেকে দেখে মনে হচ্ছে যেন ঠিক প্রদীপের মালা দিয়ে পাহাড়কে কেউ অমন করে সাজিয়েছে। ভারী চমৎকার।

রাতের খাওয়ার আহ্বানে হুঁস হল। আমাদের সঙ্গে মিঃ রায় ও মিঃ মুখার্জ্জীকে দেখলুম না। খবর পেলুম তাঁরা ভীষণ ব্যস্ত, পরে খাবেন।

খাওয়ার পর আমাদের ছাউনির কাছাকাছি যে সব ছাউনি আছে সেগুলি ঘুরে দেখব বলে বেরুলুম।

এখন সেই বিরাট জনসমুদ্র পূর্ব্বের চেয়ে কিছু শান্ত মূর্ত্তি ধারণ করেছে। বাচ্চারা বেশীর ভাগই ঘুমিয়ে পড়েছে। ঘুরতে ঘুরতে একটা জিনিষ লক্ষ্য করলুম যে, এ হেন দুর্দ্দশার মধ্যেও যে যত পেরেছেন নিজেদের জিনিষ-পত্র সঙ্গে এনেছেন, অনেক অপ্রয়োজনীয় জিনিষও বাদ দেন নি। মাথা পিছু যে কুড়ি পাউণ্ডের বেশী জিনিষ নিয়ে যেতে দেওয়া হবে না সে খবর কি এঁরা জানেন না? কি জানি। এই সব দেখে মনে হল আমরাই হয় ত ভুল খবর পেয়েছি। মন ভারী খারাপ হয়ে গেল। আমি আমার অনেক প্রিয় জিনিস ফেলে এসেছি। এখন তাদের জন্য দুঃখ হতে লাগল, বিশেষ করে আমার ব্যাঞ্জোটির জন্য। সেটিকে সঙ্গে আনার বহু চেষ্টা করেছিলুম কিন্তু সফল হতে পারি নি। চলে আসার সময় তার জন্য ভারী কষ্ট হয়ে ছিল। মনে হয়েছিল ও যেন সামান্য কাঠের বস্তু নয়; যেন রক্ত মাংসের মানব শিশু, দুই চোখ ভরা আগ্রহ নিয়ে আমার দিকে চেয়ে আছে আমারই সঙ্গ লাভের আশায়। তাকে যত্ন করে তুলে রেখে এলুম ও সান্ত্বনা দিয়ে এলুম, "কিছু ভেবনা, আবার ত ফিরে আসছি, ভয় কি।"

ভাল লাগলনা আর ঘোরাঘুরি। ভারাক্রান্ত মন নিয়ে ফিরে এলুম নিজেদের ছাউনিতে ও ক্লান্ত দেহে ভিজে মাটির আশ্রয় নিলুম। পরে মিঃ মুখাজ্জীকে যাত্রীদের জিনিস পত্রের বহর দেখিয়ে ব্যাঞ্জোটির জন্য আক্ষেপ জানালে সে বললে, "তুমি একেবারে পাগল মানু! আগে নিজের প্রাণটা সামলাও ত দেখি … …।" এ ছাউনিতেই রাত কাটল।

পরদিন ৭ই মার্চ্চ। রাত সাড়ে চারটের সময় যখন আমায় ডেকে নিয়ে যাওয়া হল দেখি সবাই গাড়ীতে উঠে পড়েছেন, আমিই বাকী। গাড়ীতে উঠে দেখি লীনা, ধীরার কাঁচা ঘুম ভেঙ্গে যাওয়ায় তারা কান্না সুরু করেছে। তাদের শান্ত করে তাদেরই পাশে শুয়ে পড়লুম। ভীষণ শীত ও জনসমুদ্রের গর্জ্জনে প্রাণ অস্থির। মাষ্টার মশাই ও মিঃ মুখাজ্জী গাড়ীতে উঠলে পরে অন্যান্য গাড়ীগুলির সঙ্গে আমাদের গাড়ীও ক্যাঁচ কেঁচে শব্দ করতে করতে রাতের অন্ধকার ভেদ করে এগিয়ে চলল। স্বল্প চাঁদের আলোয় লক্ষ্য করলুম আমাদের গাড়ীগুলি জঙ্গলের মধ্যে দিয়ে চলেছে।

ক্রমে রাত্রির হল অবসান। পূজার শেষে প্রদীপের মত একটির পর একটি করে তারা হারিয়ে গেল আকাশের

বুকে আর দিক-চক্রবালে ঝরে পড়া আঁধারের মাঝ দিয়ে এক ঝলক হাসির মত আত্মপ্রকাশ করল প্রভাত। পূব আকাশে বিশ্ব শিল্পী তখন তাঁর লাল রঙের পাত্রটি উজাড় করে ঢেলে দিয়েছেন। আমার ক্লান্ত দেহ মনের উপর প্রভাতের শান্ত স্নিগ্ধ মনোহর রূপ শান্তি ঢেলে দিল।

একটানা সাত মাইল চলার পর গাড়ী যে গ্রামে এসে থামল তার নাম "ইন্‌ডাইংগেল।" এখানে একটি নদীতে মুখ হাত ধোয়া সেরে আবার আমরা এগিয়ে চললুম। নদীটিকে ভাল করে না দেখে চলে যেতে আমার কষ্ট হচ্ছে শুনে মিঃ মুখার্জ্জী জানালে, "এগিয়ে গিয়েও আমরা এই নদীকে পাব।"

গাড়ীতে যেতে যেতে লক্ষ্য করলুম রাস্তা লাল মাটির আর দু'পাশে কত রকমের গাছ, লতা পাতা, ও ঘাসের জঙ্গল। গাছপালা সম্বন্ধে আমার জ্ঞান অত্যন্ত সীমা বদ্ধ। তাদের ভাল লাগে কিন্তু কে যে কোন জাতীয় তা চিনতে পারি না বা নামও জানিনা। মাষ্টার মশাইকে জিজ্ঞাসা করে দু'চারটির মাত্র নাম জানতে পারলুম। সূর্য্যের আলো পড়ে সীমাহীন জঙ্গল কি অপরূপ রূপই না ধারণ করেছে। রাস্তার ধারে বহু দিনের পরিচিত নাম না জানা

এক রকম ফুল দেখলুম। কাঁটায় ভরা সবুজ ছোট্ট গাছে বাসন্তী রঙের ফুল হয়। আমার বর্ত্তমান মামার বাড়ী মগমায় (মানভূম জেলায়) এই ফুলের ছড়াছড়ি। অতি নগণ্য ফুলের গাছ, জঙ্গলে অবহেলার মধ্যে আপনিই হয় ও অজস্র ফুল বিতরণ করবার পর আপনিই আবার একদিন মাটির বুকে হারিয়ে যায়। অতি তুচ্ছ ফুল, কিন্তু আজ এই তুচ্ছ ফুল আমায় কত পুরাণ দিনের কথা মনে করিয়ে দিল। হাত ধরে নিয়ে গেল পিছনে ফেলে আসা আমার বাল্যের লীলা ক্ষেত্রে। আমি তখন খুব ছোট, ছ' সাত বছরের হব বোধ হয়। রাস্তার ধারে আগাছার জঙ্গলে গাছ আলো করে ফুটে থাকত এই ফুল আর তার সুন্দর বাসন্তী রং ও এক প্রকার মিষ্টি বুনো গন্ধ আমার উৎসুক মনকে আকর্ষণ করত। তখন কাঁটার আঘাত উপেক্ষা করে ফুল তুলতুম আর রাত্রে বিছানায় শুয়ে হাতের যন্ত্রণায় কাঁদতুম।

বহুদিন পরে আজ আবার কাঁটার আঘাত উপেক্ষা করে আমায় বাল্যের লীলা সঙ্গিনীকে আঁচল ভরে তুলে নিয়ে গাড়ীতে উঠলুম। বহুদিন আগের মত আজও তার বাসন্তী রং ও বুনো গন্ধ আমার মনকে এক অপরিসীম

আনন্দ ও এক অদ্ভুত অনুভূতিতে ভরিয়ে দিল। বর্ত্তমানের মাঝে থেকেও আমার মন হারিয়ে গেল অতীতের হাসি খুসীতে ভরা লোভনীয় দিনগুলির মাঝে।

দীর্ঘ অসমতল পথ অতিক্রম করে দুপুরে আমরা যে গ্রামের প্রান্তে এসে থামলুম তার নাম "ইম্‌বাউং।" এখানে এসে সত্যিই নদী পেলুম এবং খোঁজ নিয়ে জানলুম এটি আগের দেখা নদী। কাপড় জামা নিয়ে তক্ষুনি নদীতে গিয়ে উপস্থিত হলুম। নদীর তীর থেকে জল প্রায় কুড়ি বাইশ হাত নীচে। দু'পাশের লালমাটির তীরের মাঝখানে স্থির ঘোলাটে নদীর জলকে দেখে মনে হয় ঠিক যেন লাল পাড়ের একটি গঙ্গাজলী রঙের সাড়ী পাতা রয়েছে।

ঢালু পাড় দিয়ে নদীতে নেমে দেখি বর্মীদের ছোট ছোট বাচ্চাগুলি ঘাটের কাছে নদীর জলকে একেবারে তোলপাড় করছে। স্থানীয় লোকদের জিজ্ঞাসা করে জানলুম যে নদীটি উপরে যেমন স্থির ভেতরে তেমন নয় বরং বিপরীত। কাজেই বহু কষ্টে জলের সঙ্গে দুষ্টামী করবার লোভ সামলে কেবল স্নান করে নিলুম। নদীর ধারে লজ্জাবতী লতার ছড়াছড়ি। নদীর সাথে দুষ্টামি করবার সাধ আমি এদের উপর দিয়ে পূরণ করলুম। যেই

একটি লতাকে ছুঁই অমনি সে কুঁকড়েএতটুকু হয়ে যায়—যেন লজ্জায় সারা।

গরুর গাড়ীর ছায়ায় বসে আমরা সবাই দুপুরের খাওয়া শেষ করলুম। খাওয়ার পর সবাই কাছেই যে একটি ছোট্ট ছাউনি পাওয়া গিয়ে ছিল তার মধ্যে প্রচণ্ড গরমের হাত হতে রক্ষা পাবার জন্য আশ্রয় নিলেন। আমি হাত ধোবার ছল করে নদীতে পালালুম।

আমরা যেখানে এসে থেমেছি তার চারিদিকে ছোট বড় নানা রকমের পাহাড়, দেখে মনে হয় যেন আমরা একটি দুর্গের মধ্যে আছি আর ওগুলি তারই প্রাচীর। পাহাড়ের কোলে নানা প্রকার সবুজের ঢেউ বয়ে গেছে। সবুজের ঢেউ আবার ঘিরে আছে বহুদূর বিস্তৃত আমাদের এই মাঠ আর এই মাঠকে দু'ভাগ করে আয়নার মত এঁকেবেঁকে নদীর ধার ঘেঁসে চলে গেছে লালমাটীর রাস্তা। সূর্য্য এখন ঠিক আকাশের মাঝখানে; তার ঝক্‌ঝকে আলো পাহাড়, গাছ, ভূমি ও নদীর উপর ঝরে পড়ছে। দু'পা জলের মধ্যে ডুবিয়ে দিয়ে মুগ্ধ দৃষ্টিতে প্রকৃতির এই অপরূপ রূপ দেখলুম। ইচ্ছা ছিল সন্ধ্যা পর্য্যন্ত নদীর ধারে থেকে সূর্য্যাস্ত দেখে নেব, কিন্তু সাহস হল না। কি জানি দীর্ঘ

কাল অনুপস্থিত থাকলে সঙ্গীরা যদি ভাবেন, তাই খানিক পরে উঠে পড়লুম। কিন্তু তাদের কাছে পৌঁছবার আগেই একটি চমৎকার দৃশ্য দেখে মধ্য পথেই থামতে হল। দেখি সূর্য্যকে একটি বিরাট ধূসর মেঘে ঢেকে ফেলেছে তাই তাকে আর দেখা যাচ্ছে না, কিন্তু ধূসর মেঘের চারপাশ দিয়ে সূর্য্যের কিরণ অজস্র ভাগে বিভক্ত হয়ে তির্য্যক ভঙ্গীতে মাটিতে নেমে আসছে; দেখে মনে হয় একটি উৰ্দ্ধোৎক্ষিপ্ত আলোর ফোয়ারাকে যেন মাটির দিকে উপুড় করে দেওয়া হয়েছে। আমি এমন দৃশ্য পূর্ব্বে দেখিনি।

বিকাল বেলা আমরা আবার আমাদের যাত্রার জন্য প্রস্তুত হচ্ছি এমন সময়ে যাত্রী ভর্ত্তি একটি বাস আমাদের ছাউনির সামনে রাস্তায় এসে দাঁড়াল। এই বাসটি কালেওয়া থেকে ভারতগামী যাত্রীদের নিয়ে টামু চলেছে। গাড়ী থেকে যে সব যাত্রী নামলেন তার মধ্যে একজন মান্দালয়ের কোন ডাক্তারের স্ত্রী। তিনি আমাদের সঙ্গে খানিকক্ষণ কথা বলে আবার বাসে গিয়ে উঠলেন। ভদ্রমহিলা অত্যন্ত সৌখিন। দেখলুম, এ হেন বিশৃঙ্খলার মধ্যেও তিনি সাজের ঢেউ তুলে চলেছেন।

পাঁচটা নাগাত আমাদের যাত্রা সুরু হল। এইখান

থেকে আমরা ভীষণ ধূলো পাই। গাড়ীগুলি রাস্তা অন্ধকার করে চলেছে। ধূলো থেকে নিজেদের বাঁচাবার জন্য সকলে গাড়ীগুলিকে কাপড় দিয়ে ঘিরে তার মধ্যে আশ্রয় নিল। আমার উপরেও হুকুম এলো কাপড়ের আড়ালে আসার জন্য। এই কথা শুনে ত আমার চোখে অন্ধকার নেমে এলো ও অনেক অনুনয় বিনয় করবার পর শুধু মুখটি বাইরে রাখার অনুমতি পেলুম।

ধূসর পাহাড় ও সবুজ জঙ্গলের মাঝ দিয়ে এঁকেবেঁকে চলে যাওয়া লাল মাটির রাস্তা দিয়ে আমাদের গাড়ীগুলি নানাপ্রকার কান্নার স্বর ভাঁজ্‌তে ভাঁজ্‌তে এগিয়ে চলল।

সমস্ত পৃথিবী এসময়ে এক মনোরম রূপ ধারণ করেছে। পশ্চিম আকাশে সোনার ছড়াছড়ি, আর তার উজ্জ্বল রশ্মি পৃথিবীর বুকে পড়ে তাকেও করে তুলেছে স্বর্ণময়। ক্রমে রঙের পরিবর্ত্তন হল, সোনালী হল গোলাপী, তারপর ফিরোজা। শেষে দিকচক্রবাল ঘিরে চক্রাকারে দেখা দিল ধূসর এবং এক সময়ে ম্লান আলো মাখান আকাশের মুখ খানি ঢেকে গেল হীরকখচিত কালো ওড়নায়। দূরের পাহাড়গুলি অন্ধকারের বুকে হারিয়ে গেল, আর দু'পাশের জঙ্গল আঁধারের স্পর্শে হয়ে উঠল রহস্যময়। দিনের

আলোয় সেস্থানে যেটুকু কোলাহল ছিল রাত্রির আগমনে তার শেষ হল। চারিদিক নিস্তব্ধ নিঝুম। গাড়ীগুলির ভিতরে শ্রান্ত ক্লান্ত মানুষগুলিরও সেই অবস্থা। কেবল সেই অন্ধকারের মধ্যে ভারতগামী কুলিদের চলাচলের আভাষ মাঝে মাঝে পাওয়া যাচ্ছে। কাপড়ের ফাঁক দিয়ে মুখ বার করে আমি রাত্রির রূপ ও অবোধ জীবগুলির উপর গাড়োয়ানদের কর্কশ স্বরে অবিশ্রাম বাক্য বর্ষণ উপভোগ করতে করতে এগিয়ে চলুম।

রাত্রিতে আমরা যে গ্রামে এসে থামলুম তার নাম "কাণ্ডি।" ক্লান্ত মানুষগুলিকে কষ্টে তোলা হল। বিরক্তিতে বাচ্চারা ধরল কান্না। মুখ হাত ধুয়ে সঙ্গে রান্না করে খানা খাবার খেতে গিয়ে দেখি ঢাকা থাকা সত্বেও লাল মাটীর স্পর্শে তা অখাদ্য হয়ে গেছে। কষ্টে তাই সকলে গলাধঃ করণ করে গাড়ীতে অপরিসর স্থানে শয্যা নিলুম। অন্ধকার রাত্রে নিস্তব্ধ উন্মুক্ত স্থানে গরুর গাড়ীর মধ্যে রাত্রি যাপন সকলের জীবনেই এই প্রথম, কাজেই সকলের মন অজানিত আশঙ্কায় থম্ থম্ করছে। সকলেই ঐ একই বিষয়ে আলোচনা করতে করতে ক্ষুণ্ণ মনে গাড়ীতে গিয়ে উঠলেন। কিন্তু ক্ষণপরেই সকলে অস্বাভাবিক পারিপার্শ্বিক অবস্থা ও

আশঙ্কা ভুলে ক্লান্তির দরুণ গভীর নিদ্রার মাঝে হারিয়ে গেলেন। শুধু আমি রাত্রির কালো বর্ণের সঙ্গে চাঁদের আলোর মিলনোৎসব দেখবার জন্য জেগে রইলুম।

চারধার এখন সম্পূর্ণ নিস্তব্ধ নিঝুম, কোন কোলাহল নেই কোন মৃদু গুঞ্জরণও নেই, সমগ্র পৃথিবী যেন পাথরে পরিণত হয়েছে। আমার বিশ্রামের খবরে মনের দ্বারে কত চিন্তা, কত স্মৃতি ও কত বেদনা ভিড় করে দাঁড়াল তাদের বক্তব্য নিয়ে। কি যেন হয়ে গেল। কে আর কবে ভেবেছিল যে নীড়হারা হয়ে এমন ভাবে বনে জঙ্গলে ঘুরে বেড়াতে হবে। কোথায় গেল সুখ-দুঃখের স্মৃতিমাখান দেশ, পরিচিত বন্ধুজন ও হাসি খুসীতে ভরা দিনগুলি। এই দিনে গতমাসে ছিলুম কোথায় আর আজ আছি কোথায়। জানিনা সে দেশ এখন কতখানি শত্রুকবলিত হয়েছে ও তার অধিবাসীরা কি করছে। পিছনে ফেলে আসা মানুষগুলির জন্য বেদনা অনুভব করলুম। অতীতের পাশাপাশি বর্ত্তমানেও এসে দাঁড়াল। কি জানি কি হবে, কবে পৌঁছব, সত্যই কোন দিন পৌঁছুতে পারব কিনা, অথবা তার আগেই মৃত্যুর সাথে পরিণয় সূত্রে আবদ্ধা হ'ব ইত্যাদি।

এমনিই দুঃখে ভরা চিন্তার মধ্যে ডুবে কত রাত্রে,

কোন সময়ে কতক্ষণের জন্যে যে আমার ক্লান্ত দেহমন সৌন্দর্য্যের কাছ থেকে বিদায় নিয়ে বিশ্রামের বুকে সুপ্ত ছিল জানিনা। যখন ঘুম ভাঙ্গল দেখি চাঁদ ঠিক আমাদের মাথার উপরে, আর আকাশ তার আলোয় হয়ে উঠছে স্বচ্ছ।

ঘুমন্ত যাত্রীদের নিয়ে গাড়ী এখন চলতে সুরু করল। গাড়ী যত এগিয়ে চলেছে দেখি বন তত গভীর হয়ে উঠছে। চাঁদকে দেখছিলুম গাছের ফাঁক দিয়ে দিয়ে। গাছগুলিকে মনে হচ্ছে যেন চিক্। চিকের এক পাশে রয়েছি আমি আর এক পাশে রয়েছে চাঁদের আলো মাখান স্বর্ণময় পৃথিবী।

গাড়ীর স্বল্পস্থানে সর্ব্বাঙ্গ গুটিয়ে সারা রাত্রি এক ভাবে শুয়ে থেকে শরীরের দারুণ যন্ত্রণায় প্রাণ এখন অস্থির। আশে পাশে চোখ বুলিয়ে দেখলুম কোন ব্যবস্থা করা যায় কিনা। কিন্তু কোন উপায়ই দেখতে পেলুম না একমাত্র আমার পাশে যারা দেহের ক্লান্তি দূর কবতে পরম নিশ্চিন্তে ঘুমচ্ছে তাদের ব্যস্ত করা। ঘুমন্ত মানুষগুলির দিকে চেয়ে ভারী হিংসা হয় আমার। কি সুখী ওরা! এত অসুবিধার মধ্যেও কেমন আরামে ঘুমিয়ে আছে, আর আমার? কিন্তু

তক্ষুনি মনে সান্ত্বনা খুঁজে পেলুম। সত্যি ওদের মত আমারো চোখে যদি গাঢ় ঘুম থাকত, তবে কি এমন উন্মুক্ত আকাশের তলে প্রকৃতির মাঝখানে থেকে রাত্রির এমন মধুময় রূপ উপভোগ করতে পারতুম যা অতীতে কোনোও দিন এমন করে উপভোগ করিনি, আর ভবিষ্যতে কোনোও দিন যে এমন করে উপভোগ করব তারও সম্ভবনা নেই। এখন বুঝতে পারছি এই সময়ে এই অসুখ আমার পক্ষে ভগবানের আশীর্ব্বাদ। আমার মন যন্ত্রণা ভুলে আকাশের স্বচ্ছতায়, পাহাড়ের বিচিত্রতায়, বনের রহস্যময়তায় ও আলো আঁধারের লুকোচুরি খেলার সৌন্দর্য্যের মাঝে হারিয়ে গেল।

ক্রমে শেষ রাত্রির স্বচ্ছ আঁধার স্বচ্ছতর হয়ে নেমে এলো যেন মাটির বুকে আর ঝক্‌ঝকে আকাশে স্বর্ণজলের ছড়া দিয়ে দিননাথকে জানান হল দিনের আহ্বান।

আজ ৮ই মার্চ্চ। দিনের আলোর স্পর্শে আমাদের সঙ্গীরা সব উঠে পড়েছেন। সকলের মুখেই এক কথা, "ওরে বাপ্. গায়ের ব্যথায় মরে গেলুম। কোথায় গাড়ী থামবে?"

বেলা আট্‌টা নাগাত আমাদের গাড়ীগুলি এসে থামল এক মাঠের মাঝখানে। খোঁজ নিয়ে জানলুম আমরা

এসেছি এক গ্রামের প্রান্তে যার নাম "ওউকান।" গাড়ী থেকে নেমে আরামের নিশ্বাস ফেললুম। কি শাস্তি এই গাড়ীর মধ্যে শোয়া। এই ত সবে এক রাত কাটল। এখন নাকি পাঁচ রাত এই গাড়ীতে শুয়ে কাটাতে হবে। উঃ! তার আগেই না পাগল হয়ে যেতে হয়। মানুষের শরীর আরাম প্রিয় সন্দেহ নেই। তেমনি সে যে কত সহনশীল তা' বুঝতে পারা যায় দুঃখের সম্মুখীন হলে।

গাড়ী থেকে নেবেই প্রথম চিন্তা স্নানের। গাড়োস্নানরা জানাল যে মাঠ যেদিকে গড়িয়ে গেছে সেই দিকে গেলেই জল পাওয়া যাবে। তাদের নির্দ্দেশ অনুসারে মেয়ে দুটিকে নিয়ে এগিয়ে গেলুম। খানিক দূর এগিয়ে গিয়ে দেখি মাঠ থেকে দু'পাশে বেড়া দেওয়া একটি পথ খুব নীচুতে নেবে গেছে। রাস্তার মুখে দাঁড়িয়ে ছোট মিঃ কাওয়ানজী জাহাঙ্গীর। তাঁর স্নান সারা হয়ে গেছে। আমায় দেখে হাসি মুখে 'সুপ্রভাত' জানিয়ে বললেন যে খানিক দূরে চমৎকার এবং ঠাণ্ডা জল রয়েছে। কোথায় জিজ্ঞাসা করলে আমাদের একেবারে ঝর্ণার ধারে পৌঁছে দিলেন।

ঝর্ণা বহু দূরে, এখানে তার জল সমতল ক্ষেত্রে বালির

মাঝ দিয়ে অজস্র ছোট বড় পাথর ডিঙিয়ে ঝির ঝির শব্দে বয়ে চলেছে। সত্যিই ভারী ঠাণ্ডা জল। জলের ধারে বহু বর্মীজ স্ত্রী, পুরুষকে দেখলুম। পুরুষরা এসেছেন কাপড় ও সাবান নিয়ে, মেয়েরা এসেছেন কেউ জলের হাঁড়ি নিয়ে কেউ বাসন নিয়ে, আবার কেউ আমারই মত বাচ্চাদের নিয়ে। স্ত্রী পুরুষরা জলে নেবে স্নানের সঙ্গে ছোট খাট বাক্য ও হাসি বিনিময় করছেন, আর বাচ্চারা জলে নেবে বালি ও পাথর নিয়ে জলের বুকে প্রায় দক্ষযজ্ঞ করছে। আমায় দেখে জিজ্ঞাসা করল কোথা থেকে আসছি, কোথায় যাব। যুদ্ধের কথা শুনে সহরের অবস্থা এখন কেমন জানতে চাইল। এদের জীবনযাত্রা ও চলা ফেরার মধ্যে যুদ্ধ এখনও লেশ মাত্র ছায়া পাত করতে পারেনি।

মেয়ে দু'টিকে তাড়াতাড়ি স্নান করিয়ে উপরে পাঠিয়ে দিলুম। তারপর জল ভেঙ্গে অপর পারে উপস্থিত হলুম। এখানে বহুদূর বিস্তৃত বালির চড়া। তার উপর চলতে গেলে অর্দ্ধেক পা বালির মধ্যে ডুবে যায়। ভারী মজা লাগল আমার তার উপর দিয়ে চলতে। বালির চড়া যেখানে শেষ হয়েছে সেখান থেকে বহুদূর বিস্তৃত ছোট বড় পাথরের মাঝ দিয়ে দিয়ে কাঁটাযুক্ত ছোট ছোট গাছের

ঝাড় রয়েছে, সে গাছের যেন শেষ নেই। বড় বড় গাছ সেই সব ছোট ছোট গাছের মাঝে আছে, কিন্তু সংখ্যায় তা' নিতান্তই অল্প। ঐ ঝাড়ের মত গাছই বেশী। গাছগুলি থেকে ভারী মিষ্টি একপ্রকার বুনো গন্ধ ভেসে আসছিল। আমি ত বহুক্ষণ সাড়ী বাঁচিয়ে তাদের মাঝে মাঝে ঘুরে বেড়ালুম। একেবারে অন্য মনস্ক হয়ে গিয়েছিলুম। হুঁস হতে দেখি শরীরের ব্যথা একেবারে সেরে গেছে, কিন্তু রোদ ও বালির গরমে মাথা ফাটব ফাটব করছে ও পায়ের তলা জ্বলে যাচ্ছে। তাড়াতাড়ি জলের ধারে ফিরে এসে দেখি সঙ্গীরা সব স্নান সেরে ফিরে গেছেন আমিই শুধু বাকী।

স্নান সেরে এসে দেখি ভীষণ ব্যাপার। সবাই চায়ের আয়োজন নিয়ে বসে আছেন, কিন্তু খেতে পাচ্ছেন না—কারণ কনডেন্সড্ মিল্কের টিন আমার অধীন। শরীরের ব্যথা সকালে বরফের মত ঠাণ্ডা জলে স্নান ও চায়ের বিলম্ব সবগুলি মিলিয়ে চা পিপাসুদের রীতিমত চঞ্চল করে তুলেছে। আমি অর্লিক্‌স্ ও বিস্কুটের সৎকার করে আবার জলের ধারে পা বাড়ালুম।

যতদূর দৃষ্টি যায় ছোট বড় পাথর মেশান বালির প্রান্তর

দূর দিকচক্রবালে—যেখানে ধূসর রঙের পাহারগুলি আকাশের বুকে ঢলে পড়েছে সেখানে গিয়ে শেষ হয়েছে। সেই বালির প্রান্তরের মাঝে বর্মীজদের ছোট ছোট কাঠের কুঁড়ে ঘরগুলি থেকে এখন লতান ধোঁয়া আত্মপ্রকাশ করে প্রতি গৃহস্থের কর্ম্মব্যস্ততার খবর জানাচ্ছে। জলেরও ব্যস্ততার সীমা নেই। সূর্য্যের আলো চুরি করে কাঁচের মত ঝক্‌ঝকে জল ছুটে চলেছে কোন অজানার পরশ পাবার লোভে। স্বচ্ছ জলের মধ্যে দিয়ে দিনের আকাশকে স্পষ্ট দেখা যাচ্ছে। সবগুলিকে মিলিয়ে মনে হয় যেন দক্ষ শিল্পীর সযত্নে আঁকা একটি ছবি—নিখুঁত ও সুন্দর।

আজ আমাদের খাবারের আয়োজন এবং স্থান দুই-ই একেবারে উন্মুক্ত আকাশের নীচে প্রখর সূর্য্যের আলোর মধ্যে। ধূলা মাখান গাড়ীগুলিকে আড়াল করে ও তাদের পাশে বসে কোন রকমে সবাই খাওয়া শেষ করলুম। খাওয়া ত হল এখন দুপুর বেলা এই প্রচণ্ড সূর্য্যতাপের হাত থেকে রক্ষা পাওয়া যায় কি করে। অনেক আলোচনা ও পরামর্শ করা গেল, কিন্তু কিছুই ফল হল না। অগত্যা গাড়ীগুলি আড়াল করে মাথায় কাপড় ঢাকা দিয়ে থাকার ব্যবস্থা হল। এই দুপুরে বেড়ান যাবে না—কারণ ভীষণ রোদ, শোয়া

যাবে না—কারণ স্থান নেই, কাজেই ঠিক হল গল্প করা যাক। গল্প শোনার আশায়ও সবাই একত্রিত হলুম, কিন্তু গল্প বলবে কে? সবায়ের মন ব্যথায় ও কষ্টে ভারাক্রান্ত। তা'ছাড়া যে বিষয়ই গল্প করা যাক না কেন সব এসে দাঁড়ায় বর্ত্তমান যুদ্ধ ও আমাদের দুর্দ্দশা প্রসঙ্গে, কাজেই গল্প জমল না। আমরা বড়রা সবাই চুপ করে রইলুম, কিন্তু দুবছরের কুম্‌কুম্ সাইরেণের শব্দে দুপুরটিকে মাতিয়ে রাখল। প্রথমে সে মুখে একটানা সাইরেণের আওয়াজ করে ও যেন ভীষণ ভয় পেয়েছে এমন ভাব দেখিয়ে চোখ ঢেকে ফেলে। আবার খানিক পরে থেমে থেমে সাইরেনের মত আওয়াজ করে ও চোখ থেকে হাত নামিয়ে ফিক্ ফিক্ করে হাসতে থাকে, যেন তার সব বিপদ কেটে গেছে। সে মুখে সাইরেনের আওয়াজ করলেই তার দিদিমা চটে আগুন হন, "কি আশ্চর্য্য মেয়ে! কেবল ঐ অলুক্ষণে আওয়াজ মুখে লেগে আছে! চুপ কর, চুপ কর।" কিন্তু কে কার কথা শোনে। শিশু তার খেলা কিছুতেই ছাড়েবে না, সমানে মুখে আওয়াজ করে চলেছে। "পোঁ·····ওঁ·· ··ওঁ।"

এই ভাবে যখন আমাদের আসর চলেছে তখন

আমাদের কাছাকাছি কয়েকটি গরুর গাড়ী এসে দাঁড়াল, আর তার থেকে একটি মাড়োয়ারী পরিবার আত্মপ্রকাশ করল। দেখলুম মানুষগুলি প্রায় এক একটি বিরাটকার মাংসের পাহাড়।

আমাদের কাছাকাছি তাঁরা সংসার পেতে বসলেন। পুরুষরা গল্প আরম্ভ করলেন, বাচ্চারা চীৎকার আর গৃহিণী কাঠের উনুন জ্বেলে প্রচুর ঘি দিয়ে মচ্‌মচে করে পুরী ভাজতে লাগলেন। তাঁদের আটা আনতে দেখে আমাদের আটা সঙ্গে আনার প্রয়োজনীয়তা মনে পড়ে গেল ও না আনার জন্য এখন আফ্‌সোস্‌ করতে লাগলুম।

বেবী ও আমি বসে বসে মাড়োয়ারী গৃহিণীর রন্ধন নৈপুণ্য দেখতে লাগলুম। তাঁর তৈরী জিনিষগুলির উপর লোভ যে আমাদের কম হচ্ছিল তা' নয়। এনিয়ে আমাদের দুজনার মধ্যে বহু আলোচনা হল। কিন্তু সবই বৃথা জেনে তাকে উপদেশ দিলুম, "ও আঙ্গুর ফলে লোভ করে আর কি হবে, তার চেয়ে চল খানিক ঘুরে আসি।" কিন্তু যাত্রায় বাধা পড়ল। শুনলুম এখান থেকে আমাদের সাড়ে চারটের মধ্যে রওনা হতে হবে, কাজেই তাড়াতাড়ি তৈরী হওয়া চাই। প্রথমেই চা পান সমাপনের ব্যবস্থা। আমি ও

অনেক কম পেলুম। ভেবে ঠিক করলুম পূরো রাস্তাটি এমনি ভাবেই চলব। কিন্তু সম্ভব হল না কয়েকটি খালি গাড়ী এই রাস্তা দিয়ে ফিরে যাচ্ছিল। তারা আমাদের গাড়ীটিকে অন্যান্য গাড়ী হতে অনেক দূরে দেখে গাড়োয়ানকে বললে যে, সে যেন এমন একা একা না যায় কারণ দুদিন আগে এই স্থানে সন্ধ্যাবেলা একদল ডাকাত কোনও যাত্রীদের গাড়ী আক্রমণ করে তাদের সর্ব্বস্বান্ত করেছে। তাদের কথা শুনে ত আমাদের চক্ষু চড়কগাছ। আবার অন্যান্য গাড়ীগুলির সঙ্গে সঙ্গে চলা ও সেই সঙ্গে প্রচুর ধূলো খাওয়া সুরু হল। প্রত্যেক গাড়ীর যাত্রীরা ও গাড়োয়ানরা এই খবরে অত্যন্ত ভীত ও ত্রস্ত হয়ে উঠল। সকলের মুখেই এখন এক কথা, "হে ঠাকুর, ভালয় ভালয় রাস্তা পার কর।"

সেই পথ দিয়ে সর্ব্বক্ষণ অগণিত কুলি পায়ে হেঁটে ভারতের উদ্দেশ্যে চলেছে। কয়েকজন লোককে কাপড়ের দোলায় শুইয়ে নিয়ে যেতে কয়েকবার চোখে পড়ল। শায়িত লোকগুলি দিব্যি বলিষ্ঠ, অথচ এ ব্যবস্থা কেন জিজ্ঞাসা করাতে জানা গেল যে তাদের অসুখ করেছে। কি অসুখ বুঝতে বাকী রইল না, ভয়ে মন থম্‌থম্ করতে লাগল।

রাত্রির আগমনে প্রকৃতিও এখন থম্‌থম্ করছে ; অন্ধকারের স্পর্শে সে রহস্যময় হয়ে উঠেছে। রাস্তার দু'পাশে বেশ বড় বড় গাছের বন। বাতাসের স্পর্শে তাদের পাতাগুলি সুমধুর মর্ম্মর স্বরে নিস্তব্ধ বনভূমিকে ভরিয়ে তুলছে। রাস্তা এখন আর দেখা যাচ্ছে না। দূরে আমাদের অগ্রগামী গাড়ীগুলিকে অন্ধকারে মনে হচ্ছে যেন এক একটি বিরাটকার জীব, গজেন্দ্র গমনে এগিয়ে চলেছে। মাঝে মাঝে ভারতগামী রুগ্ন, দুর্ব্বল কুলিদের ক্লান্ত কাতর আর্ত্তরবে এই নিস্তব্ধ রাস্তা মুখর হয়ে উঠছে।

আমরা যতই এগিয়ে চলেছি রাস্তা ততই খারাপ পাচ্ছি। উঁচু, নীচু রাস্তা, মাঝে মাঝে বিরাট বিরাট গর্ত্ত ও ইতস্ততঃ বিক্ষিপ্ত বড় বড় পাথর ইত্যাদি, কাজেই গাড়োয়ানদের খুব হুঁসিয়ার হয়ে গাড়ী চালাতে হচ্ছে। তাদের তীক্ষ্ণ দৃষ্টি সর্ব্বদাই পথের দিকে। আমাদের সব গাড়োয়ানগুলিই বর্মীজ। তারা ভারী সরল ও সাদাসিধা—যেমন নাকি বর্মীজরা সাধারণতঃ হয়ে থাকে। অথচ অন্যায়ের বিরুদ্ধে অতি ভয়ঙ্কর।

একটানা চলে প্রায় রাত সাড়ে আটটার সময়ে "সোয়েজি" নামে এক বর্দ্ধিষ্ণু গ্রামের মাঝখানে এক মাঠে

আমরা থাকব। গাড়ী আমাদের নিয়ে পাথরের টুকরার উপরে বয়ে যাওয়া ঝর্ণার জলের মধ্যে দিয়ে হেলে দুলে ও প্রায় লাফাতে লাফাতে এগিয়ে চলল আর গাড়ীর মধ্যে বসে আমরা ঝাঁকুনির চোটে নাচতে আরম্ভ করলুম ; সে নাচের চোটে আমাদের নাড়ী বেরিয়ে আসবার যোগাড়। ঝর্ণার জলের ধার থেকে কিছু দূরে আমাদের গাড়ীগুলি এসে থামল। গরুগুলি হাঁসফাঁস করছে, আমাদের অবস্থাও তাই।

এবার মুখ ধোবার পালা। লীনা, ধীরা, মাষ্টার মশাই, ছোট মিঃ কাওয়াসজী জাহাঙ্গীর, নাইডূ ও আমি গেলুম জলের ধারে। ছোট বড় নানা আকারের পাথরের উপর দিয়ে মধুর কলস্বরে বয়ে চলেছে ঝর্ণা জলের ধারা। কাছাকাছি কোথাও এক হাঁটুর চেয়ে গভীর জল পেলুম না। জল ঠাণ্ডা বরফের মত। মুখ হাত ধুলুম, কিন্তু একটুও শান্তি পেলুম না, কারণ সর্ব্বাঙ্গ লালমাটিতে ভর্ত্তি।

রাত্রির জন্য ঝর্ণার জলে স্নান না করতে পারার জন্য আরাম পেলুম না, কিন্তু চাঁদনি রাতে তার নয়নাভিরাম রূপ আমার মনের পাত্রকে শান্তি দিয়ে কানায় কানায় পূর্ণ করে দিল। দূরে ধূসর রঙের পাহাড়গুলি কালো আকাশের

সাথে মিশে একাকার হয়ে গেছে, আর তাদের গা বেয়ে ঝর্ণার জলের ধারার মত নেবে আসছে চাঁদের আলো একেবারে মাটির বুকে ও সৃষ্টি করছে যেন এক চমৎকার আলোর মায়াজাল। মাটির বুক থেকে সে আলো আবার ছড়িয়ে পড়েছে ফেনময়, অশান্ত ও কলকলভাষিণী সুন্দরী ঝর্ণাধারার জলে, আর তাকে করে তুলেছে, মাটির বুকে অসংখ্য তারকা খচিত যেন একটি রাতের আকাশ। আলোর স্পর্শে স্বচ্ছ, শুভ্র জল ঝল্‌মল করছে। ঝর্ণাধারার রূপালী জলের মাঝখানে দাঁড়িয়ে আমি কাঙালের মত প্রকৃতির এই মনোহর রূপ দু'চোখ ভরে আকণ্ঠ পান করতে লাগলুম আর আমার মুগ্ধ মন দৃষ্টি দিয়ে যেন চাঁদের কিরণস্নাত জল, মাঠ, বন, পাহাড় ও তারকাশোভিত আকাশকে স্পর্শ করে বেড়াতে লাগল। কি সুন্দর, কি মনোরম, কি অপূর্ব্ব এই প্রকৃতি! চাঁদের আলোকোজ্জ্বল এমনি প্রকৃতির মাঝখানে দাঁড়িয়েই বোধ হয় আমাদের কবি মরণকে স্বর্গ সমান জ্ঞান করেছিলেন। সত্যিই এমনিই সুন্দর দৃশ্য দেখতে দেখতে যদি চোখে নেমে আসে মহানিদ্রা, তবে কোনও দুঃখ নেই, কোনও ক্ষোভ নেই। আমার হৃদয় আনন্দে, শান্তিতে ও মুগ্ধতায় পরিপূর্ণ হয়ে গেছে—যেমন চাঁদের মধুর আলোয়

পরিপূর্ণ হয়ে গেছে আজকের এই পৃথিবী। রূপের নেশায় আমি ভুলে গেলুম আমার পারিপার্শ্বিক আবেষ্টনী।

চমক ভাঙ্গতে দেখি শুধু নাইডু দাঁড়িয়ে আছে। তার সঙ্গে নিজেদের আস্তানায় ফিরে এসে সকলের সঙ্গে খাওয়ায় যোগ দিলুম: সকলের মধ্যেই তখন দুর্ভিক্ষের ক্ষুধা, কিন্তু সেই লালমাটি পূর্ণ খাদ্য তৃপ্তিতে মুখে দেয় কার সাধ্য, গলা দিয়ে নামাতে কষ্টে চোখে জল এসে যায়। কোন প্রকারে খাওয়া শেষ করে মেয়ে দুটির হাত ধরে গাড়ীতে উঠলুম। আবার সেই গাড়ী, সেই স্বল্প-পরিসর স্থানে শোয়ার ব্যবস্থা। বিকাল থেকে রাত এগারোটা পর্য্যন্ত একটানা গাড়ীতে বসে বসে সর্ব্বাঙ্গ যন্ত্রণায় অস্থির, তারপর আবার এই দীর্ঘ রাত্রি শরীর গুটিয়ে একভাবে শোয়ার চিন্তায় মাথা খারাপ হবার যোগাড়। গাড়ীতে উঠতেই শরীর বিদ্রোহ ঘোষণা করল আর মন বললে, কতক্ষণে সকাল হবে? দু'পক্ষকে শান্ত করে ক্লান্তির হাত হতে রক্ষা পাবার জন্য সেই অল্প-পরিসর স্থানেই শুয়ে পড়লুম। কিন্তু ঘুম? সে যে এখন আমার ত্রিসীমানায় কোথাও আছে বলে মনে হয় না।

আমার পাশের মানুষগুলি শীঘ্রই ঘুমে অচৈতন্য হয়ে

গেল। অন্যান্য গাড়ীগুলিরও সেই অবস্থা। চারিদিক এখন নিস্তব্ধ নিঝুম। চুপচাপ শুয়ে থাকতে থাকতে কখন এক সময়ে অতীতের মাঝে গিয়ে দাঁড়ালুম। সেদিনের কত স্মৃতি আমায় ঘিরে দাঁড়াল। তার মধ্যে কোনগুলি দুঃখ জড়ান, কোনগুলি শান্তি মাখান আবার কোনগুলি হাসি ছিটান। এমনি জঙ্গলের মাঝে গরুর গাড়ীতে না হলেও ভ্রমণে বেরিয়ে জীবনে বহুবার বাহিরে রাত্রি যাপন করেছি, কিন্তু সে সব দিন ছিল কত হাসিখুসীতে ভরা, কত মধুর। সেদিন বাহিরে রাত্রি যাপন করতে একটুও ভয় বা কষ্ট হয়নি বরং মনে হয়েছে রাতটি যদি আরো দীর্ঘ হত, তবে কত না মজার হত। এমনি শান্তিতে ভরা বিগত কত চাঁদনি রাত আমায় ঘিরে দাঁড়াল। আজও তেমনি চাঁদনি রাত আর আমারাও তেমনি বাহিরে রয়েছি। কিন্তু হায়, সেদিনের সে সব রাতগুলির সঙ্গে আজকের এ রাতের কত তফাৎ, এ কত বিপরীত।

আমি গরুর গাড়ীর একেবারে পিছনে রয়েছি। এখন গরুর গাড়ীর উপর থেকে পর্দা তুলে নেওয়ায় বাইরের সব কিছুই স্পষ্ট দেখতে পাওয়া যাচ্ছে। শুনেছিলুম আমরা এক গ্রামের প্রান্তে এসেছি, কিন্তু বার বার চেষ্টা করেও

আমি গ্রামের চিহ্ন কোথাও দেখতে পেলুম না। আমাদের একদিকে বিরাট বিরাট গাছের বন আর একদিকে দিগন্ত বিস্তৃত প্রান্তর,—যার শেষে বিচিত্র ভঙ্গীতে দাঁড়িয়ে আছে বহু পাহাড়। কিন্তু এখন তাদের ভাল করে চেনা যাচ্ছে না, মনে হচ্ছে যেন ছায়া, যেন ওগুলি পাহাড় নয়, চাঁদের-আলো মাখান আকাশ দিনের দগ্ধ পৃথিবীর বুকে রাত্রির স্নিগ্ধতা ঢেলে দিতে নীচে নেমে এসেছে। প্রান্তরের স্থানে স্থানে নানা আকারের নানাজাতীয় গাছ দাঁড়িয়ে রয়েছে। আলোর পোষাক পরা এই গাছগুলিকে মনে হয় যেন রাতের প্রহরী, নিঃশব্দে প্রভাতের অপেক্ষা করছে। বনের গাছগুলির অবস্থা কিন্তু বিপরীত। তাদের ডাল-পালার ফাঁকে ফাঁকে রাতের আঁধার জমাট বেঁধে গেছে পুঞ্জীভূত বেদনার মত। সেই অন্ধকার ভেদ করে যেটুকু চাঁদের আলো বনে প্রবেশ করেছে সেটুকু তাদের যেন রহস্যময় অশরীরীর দল করে তুলেছে। গভীর নিস্তব্ধ রাত্রি, চারি-দিক নিঝুম, সব কিছু স্থির, নিশ্চল, শুধু চাঁদ অবিরাম ঢেলে চলেছে আলো আর মৃদু গুঞ্জনে ঝর্ণার ধারা অবিশ্রান্ত গেয়ে চলেছে সুমধুর গান।

প্রকৃতির মধুর স্পর্শে ও মনোহর দৃশ্যে আমার মনে

শান্তি ফিরে পেলুম। ভেবে দেখলুম মানুষের জীবন ত পাহাড়ী নদী, যতদিন প্রাণ আছে ততদিনই আছে তার গতি ; গতি থাকা পর্য্যন্ত তাকে চলতেই হবে, এবং চলতে গেলেই স্থানে স্থানে তাকে বাধা পেতেই হবে। সেই বাধা অতিক্রম করতে যেমন আছে আনন্দ তেমনি আছে ব্যথা, আর চলতে গেলেই এই সব যখন অনিবার্য্য তখন শুধু ভেবে দেহ এবং মনকে ক্লান্ত করে লাভ কি ! তার চেয়ে মন বললে, "তারচেয়ে ঘুমের চেষ্টা কর।"

এক ঝলক হাসির মত উজ্জ্বল চাঁদ দূর আকাশ থেকে পালিয়ে পশ্চিম আকাশে গিয়ে এখন পাণ্ডুর রূপ ধারণ করেছে। বুঝলুম সে ঘুমের সুযোগ খুঁজছে। মনকে "তথাস্তু" বলে চোখ বুঝলুম।

আজ ৯ই মার্চ্চ। চোখ খুলে দেখি পূব আকাশে যেন রাশি রাশি রাঙা জবা ছড়িয়ে দিনের পূজা সুরু হয়েছে। মুখ হাত ধুতে গত রাত্রের সেই বর্ণা ধারার কাছে এলুম। সুন্দরী এখন দিনের আলোর স্পর্শে আর এক রূপ ধারণ করেছে।

সাতটার মধ্যেই আবার আমাদের যাত্রা সুরু হল। গাড়ীর মধ্যে শুয়ে সকলেই গায়ের ব্যথায় অস্থির ও তন্দ্রুনি

চলতে নারাজ। কিন্তু উপায় নেই, কারণ আজ নাকি আমাদের সামনের এই কুড়ি মাইল লম্বা বনের মধ্যে দিয়ে চলতে হবে। তাড়াতাড়ি রওনা না হলে ঠিক সময়ে যথাস্থানে পৌঁছতে পারব না। অগত্যা সকলেই অনিচ্ছায় বিরক্তিকর নানা প্রকার গুঞ্জন করতে করতে গাড়ীতে গিয়ে উঠল ও সেগুলি তৈলের তৃষ্ণায় বুকফাটা চীৎকার করতে করতে অগ্রসর হল।

আমাদের আজকের যাত্রার সূত্রপাতেই বন। আমরা যতই এগিয়ে চলেছি বনও ততই গভীর থেকে গভীরতর হচ্ছে। সেই গভীর বনের মধ্যে দিয়ে লালমাটির রাস্তাটি এঁকে বেঁকে চলে গেছে। কত নানাজাতীয় গাছ, কত রকম তাদের রং ও কত বিচিত্র তাদের গঠন ভঙ্গী যে বর্ণনা দিয়ে শেষ করা যায় না। ছোট ছোট ঘাস, নানা রকম লতা, ছোট ঝাড় থেকে আরম্ভ করে বিরাট বিরাট বট, অশ্বত্থ এবং প্রায় পঁয়তাল্লিশ ফিট দীর্ঘ ও মসৃন সেগুন গাছও আছে— যাদের সংখ্যা বনে সর্ব্বাপেক্ষা বেশী। বসন্তের আগমনে প্রত্যেক গাছের বেশীর ভাগ পাতাই শুকিয়ে চলার পথে ঝরে তাকে প্রায় ঢেকে দিয়েছে ও সামান্য আঘাতেই তারা মর্ম্মরধ্বনি তুলে বনভূমিকে মুখরিত করে তুলেছে। পাতা

ঝরা গাছে আবার নূতন পাতা দেখা দিয়েছে, সেগুলি কেমন মসৃণ ও সুন্দর। গাছে গাছে কত রকমের সবুজ রঙের ছড়াছড়ি যে কি বলব। কোনগুলি গাঢ় সবুজ, কোনগুলি ফিকে সবুজ, কোনগুলি মাঝারি সবুজ, কোনগুলি হলদে সবুজ, কোনগুলি বেগুণী সবুজ, কোনগুলি কালো সবুজ ইত্যাদি ইত্যাদি। সে যেন নানা প্রকার সবুজ রঙের হাট বসে গেছে। কোন্ রং ছেড়ে কোন্ রং দেখি, কোন্ রঙের চেয়ে কোন্ রং যে বেশী সুন্দর তার বিচার করি ভেবেই ঠিক করতে পারি না। সে এক বিরাট সমস্যা। কোথাও বা গাছপালা, লতা, পাতা এত ঘন যে দিনের বেলাতেই সন্ধ্যার রূপ ধারণ করেছে; কোথাও বা ইতস্ততঃ বিক্ষিপ্ত গাছগুলি মিলে বাগানের মত রূপ ধারণ করেছে; আবার কোথাও বা নানা প্রকার সবুজ রঙের কচি ঘাস সকাল বেলার মিষ্টি রোদে শিশুর মত মধুর হাসছে। প্রকৃতির মাঝখানে দাঁড়িয়ে বসন্তের এমন রূপ অতীতে এমনি করে কোনদিন দেখতে পাইনি, তাই আজ প্রকৃতির আর এক অনাস্বাদিত অপরূপ রূপের স্পর্শে আমার মন তৃপ্তিতে ও আনন্দে ভরে গেল।

গাছপালা দেখতে দেখতে বেলা এগারোটা নাগাত

আমাদের গাড়ীগুলি বনের মধ্যে একস্থানে এসে থামল। গাড়ী থেকে নেবে প্রাণ বাঁচল। ওগুলিকে এখন আর গাড়ী বলে মনেই হয় না, মনে হয় যেন জেলখানা।

গাড়ী থেকে নেবেই মাসীমা চাকরদের নিয়ে চায়ের ও রান্নার আয়োজনে বসলেন আর আমরা চললুম স্নান করতে।

বনের ভিতরে খানিক দূরে মাটির পাহাড়ের আড়ালে জল রয়েছে। কে জানে কোথা থেকে আসছে ও কার সন্ধানেই বা কোথায় যাচ্ছে। তার গতি খুব ধীর, বিশেষ ভাবে লক্ষ্য না করলে বোঝাই যায় না। ঘাট থেকে প্রায় পঁচিশ হাত দূরে জলের উপরে একটি মাটির চর জেগে রয়েছে। তার ওপাশে গাছপালায়, ঝোঁপে, ঝাড়ে এমন হয়ে আছে যে জলের অবস্থা সম্বন্ধে কিছুই বোঝা যায় না।

স্নান করতে এখন লীনা, ধীরা ও আমি বাকী। চারিদিকের ব্যবস্থা ও জলের অবস্থা দেখে আমি ঠিক করলুম আজ এখানে সাঁতার কাটব। তক্ষুনি ছুটে গিয়ে মিঃ মুখার্জ্জীকে ধরে আনলুম এবং এখানে সাঁতার কাটা খুব নিরাপদ জানিয়ে তার কাছে আমার অভিপ্রায় ব্যক্ত করলুম। সে তখন জলের দিকে চেয়ে খানিকক্ষণ দাঁড়িয়ে রইল।

তারপর বলল, "আগে আমার একটা কথার উত্তর দাও যে, তুমি কি সাঁতার কাটবে একেবারে ঠিক করে ফেলেছ ?" কিছুক্ষণ চুপ করে থেকে মুখে বললুম, "খানিকটা।" আর মনে বললুম, "সম্পূর্ণ।" সে তখন আরম্ভ করল, "তোমার ঐ খানিকটা মতও ত্যাগ কর।" তারপর বোঝাতে বসল, "দেখ মান্নু, আমরা ঘরছাড়া হয়ে এই ভাবে যে রাস্তায় রাস্তায় ঘুরে বেড়াচ্ছি এ নিশ্চয়ই আমাদের সৌভাগ্যের লক্ষণ নয়, এরপর আরো বিপদ ডেকে এনে লাভ কি। তারপর তোমার শরীর ভাল নয়, এখন যা' ত।' জলে নেবে ছেলেমানুষী করা ভাল কি ?" দেখলুম সুবিধা করতে পারব না, কাজেই বললুম, "তুমি যা' বলেছ ঠিক, এখন যেতে পার।" তারপর সে অদৃশ্য হতেই জলের নিবিড় আলিঙ্গনে নিজেকে দিলুম ছেড়ে। আমাকে ভাসতে দেখে দুই মেয়ে ত ভীষণ খুসী। তাদের হাত তালির ধুম পড়ে গেল।

সাঁতরে মাটির চর পর্য্যন্ত গিয়ে তাকে ধরে জলের মধ্যে দাঁড়াতেই দেখি সর্ব্বনাশ! অগভীর জলের নীচে নরম তুল্‌তুল্‌ করছে মাটি আর তার মধ্যে হু হু করে আমার পা চলে যাচ্ছে। এক লাফে জলের মধ্যে পড়ে একেবারে এপারে চলে এলুম। ঘাটের কাছে খানিক ঘোরাঘুরি করে

উপরে উঠতেই লীনা আমায় জড়িয়ে ধরে জানাল, "মা, আমিও সাঁতার কাটব।" ধীরাও পেছু হট্‌তে নারাজ। তাড়াতাড়ি ছুটে এসে ছোট্ট ছোট্ট হাত দুটি আমার দিকে বাড়িয়ে ঘাড় কাৎ করে জানাল, "আমিও ছাঁতাল।" বললুম, "সাবাস, এই না হলে আমার মেয়ে! চল্ দেখি আজ কত সাঁতার কাটিস্।" ভাবলুম জলে নেবে বোধ হয় তাড়াতাড়ি উঠতে চাইবে না, কিন্তু হল বিপরীত। এক ডুব দিয়ে লীনা বল্‌ল, 'হয়েছে।' ধীরা বল্‌ল, 'বাচ্।'

স্নান সেরে এসে দেখি হৈ হৈ ব্যাপার! স্বয়ং মাষ্টার মশাই মুগুর ডালের হাঁড়ি নিয়ে পড়েছেন। সমানে ডালের হাঁড়িতে হাতা দিচ্ছেন ও নানা ভাবে রান্নার লোকটিকে বোঝাচ্ছেন কেমন করে ডাল সাঁৎলাতে হয়। তাঁর এই কাজে মাসীমা হলেন প্রধান সমর্থক। মাষ্টার মশাইকে চটাবার উদ্দেশ্যে বল্‌লুম, "আজ বাঙ্গাল মুগুর ডালের হাঁড়ি ধরেছেন ত? ও ডাল আমাদের আর খেতে হবে না।" মাষ্টার মশাই একটুও না চটে এক মুখ হেসে উত্তর দিলেন, "মোটেই না বরং আজ ভাল করে খাবেন।" বল্‌লুম, "খাওয়ার সময়ে তার পরীক্ষা হবে।" তারপর মাসীমার দিকে ফিরে জিজ্ঞাসা করলুম যে মাষ্টার মশাইকে তাঁর এত

সমর্থন করার কারণ কি? তিনি শুধু হাসলেন আর উত্তর দিলেন মেসোমশাই, "বুঝলে না বৌমা, ওঁরা দুজনেই যে এক দেশের লোক, কাজেই ... ... ।" বললুম "মেসো-মশাই আজ তবে দারুণ যোগাযোগ! দেখা যাক্ মুগুর ডালের উপর এর ক্রিয়া কেমন হয়।" আমাদের মাঝে হাঁসির রোল পড়ে গেল।

সঙ্গের রান্নার লোকটি একেবারেই রান্না করতে পারত না। আজ মাষ্টার মশায়ের রান্না মুগুর ডাল অত্যন্ত উপাদেয় হয়েছিল, কাজেই ভাত খরচ প্রচুর হল। সবাই মাষ্টার মশাইকে সুন্দর ডাল রান্নার জন্য অনেক সাধুবাদ দিলেন ও অনুরোধে জানালেন যে তিনি রান্নার দিকে যেন আর না যান, তবে রাস্তায় চালের অভাবে আমাদের মুস্কিলে পড়তে হবে।

খাওয়ার পর পুরুষরা তাস খেলতে বসলেন, মেয়েরা গাড়ীর মধ্যে আশ্রয় নিলেন আর আমি বনের মধ্যে ঘুরবার উদ্দেশ্য নিয়ে তাদের মাঝ থেকে অদৃশ্য হলুম।

বনে ঢুকেই আমি যেমন অবাক হলুম, তেমনি খুসী হলুম। দেখি অগভীর ভূমির উপর দিয়ে প্রায় হাঁটু গভীর স্বচ্ছ কাঁচের মত জলের ধারা নিঃশব্দে বয়ে চলেছে। জল

এত স্বচ্ছ যে তার নীচেকার প্রত্যেকটি পাথর কুচি, ঘাস, পাতা সব কিছুই অত্যন্ত পরিষ্কার ভাবে দেখা যাচ্ছে। আমি ত কাল বিলম্ব না করে সাড়ীকে হাঁটু অবধি তুলে জলে নেবে পড়লুম। উঃ কি ঠাণ্ডা জল, বরফ বললেই হয়। জলের মধ্যে দিয়ে হাঁটতে হাঁটতে অনেকখানি দূরে এসে পড়লুম। লতায় পাতায়, ঘাসে সে স্থানটি বড্ড স্যাঁৎস্যাঁৎ করছে। কত রকমের লতা গাছদের বেয়ে উপরে উঠে গিয়েছে। তারপর একটির পর একটি গাছকে প্রদক্ষিণ করতে করতে এগিয়ে গেছে। লতাবেষ্ঠিত গাছগুলিকে দেখতে হয়েছে ঠিক লাউমাচার মত। এমন যে শুধু এই স্থানেই দেখছি তা' নয়। এই বনে প্রবেশ করে অবধি আজ সকাল থেকে এমন পরগাছা যে কত দেখছি তার শেষ নেই। বেশীর ভাগ ক্ষেত্রেই পরগাছা বেষ্ঠিত গাছগুলি শুকিয়ে গেছে। একটি গাছকে যে একটি পরগাছা বেষ্টন করে আছে তা' নয়, অমন চার পাঁচ রকমের পরগাছা একটি বা একাধিক গাছকে বেষ্টন করে আছে। একস্থানে দেখি কোন জাতীয় এক বিরাট গাছের গুঁড়ির উপরে এক খেজুর গাছ উঠেছে। আবার সেই খেজুর গাছকে নানা প্রকার পরগাছা বেষ্টন করে আছে। প্রথম গাছটির ত

একটিও পাতা নেই, খেজুরগাছটিও প্রায় আধমরা, কিন্তু পরগাছাগুলি বেশ সতেজ ও সুন্দর। কত রকমের গাছ কত রং বেরঙের পাতা, আর কত বিচিত্র লতা এই বনে রয়েছে। তাদের মাঝখানে দাঁড়িয়ে আমার ভারী আফ্‌-শোস্‌ হতে লাগল এই জন্য যে কে কোন জাতীয়, কার কি নাম কিছুই জানিনা। কেবলি মনে হতে লাগল এ বন দেখা আমার যেন অসমাপ্ত রয়ে গেল। তবু কিন্তু তাদের বড় ভাল লাগল, মনে হতে লাগল তারা যেন আমার বড় আপনার জন, যেন বহু যুগ যুগ ধরে তাদের সঙ্গে আমি কি এক নিবিড় বন্ধনে বাঁধা পড়ে আছি। সকাল থেকেই একপ্রকার বুনো মিষ্টি গন্ধ সর্ব্বদা পেয়ে আসছি, এখনও পেলুম। এখন দুপুর বেলা, কিন্তু বনের মধ্যে বেশ ঠাণ্ডা। সেই দুপুরেও সমস্ত বন নিস্তব্ধ নিঝুম, বোধ হয় একটি ছুঁচ্‌ ফেল্‌লেও তার আওয়াজ পাওয়া যায়। এমন একটানা নিস্তব্ধতা কিন্তু মোটেই বিরক্তি উৎপাদন করে না বরং মনে চমৎকার পবিত্রভাব ও শান্তি এনে দেয়।

আবার সেই জল ধারার উপর দিয়ে ফিরে চলেছি। আমি এ বনে সম্পূর্ণ নবাগতা। যাদের কাছে এসে আমার জীবনের গতি আজ খানিকক্ষণের জন্য থম্‌কে দাঁড়াল আমি

না জানি তাদের জীবন-রহস্য, না চিনি তাদের তফাৎ আর না বুঝি তাদের ভাষা। তবু ফেরার পথে মনে হতে লাগল আমি যে মনটি নিয়ে এই বনে এসেছিলুম তার সবখানি যেন আমার সঙ্গে যাচ্ছে না। তার কিছু অংশ যেন রয়ে গেল ঘাসের সবুজ রঙে, পাতার গুঞ্জনে, বনের বুনো গন্ধে ও জলের ঝিরঝির শব্দে। প্রজাপতির দেখছি ছড়াছড়ি, নানারঙের স্পর্শে বনের নানা প্রকার সবুজ রঙের মতই তারা বড় বিচিত্র। কিন্তু আশ্চর্য্য যে এত বড় বনে একটি পাখীরও সুমধুর কলধ্বনি শুন্‌তে পেলুম না।

বেলা সাড়ে পাঁচটার সময়ে আমরা যাযাবরের দল আমাদের অস্থায়ী সংসারটিকে নিয়ে গাড়ীতে উঠলুম। গাড়ী গাছের ফাঁক দিয়ে দিয়ে রাঙ্গা-মাটির রাস্তা ধরে এগিয়ে চলল। সবুজ বনের সবুজ মায়ার জালে আমি নিবিড় ভাবে বাঁধা পড়ে গেছি, তাই গাড়ীর অগ্রগতি ও অন্ধকারের আগমনের সঙ্গে সঙ্গে আমার মন নিস্তেজ হয়ে পড়ছে। শুন্‌ছি কাল সকাল দশটার মধ্যেই আমরা নাকি এ বন ছেড়ে উন্মুক্ত প্রান্তরে গিয়ে পড়ব।

গাড়ীতে মিঃ মুখার্জ্জী, মাষ্টার মশাই ও আমাকে নিয়ে আসর জমে। আজ আমি চুপচাপ হয়ে যাওয়ায় ওঁরা

দুজনে খানিক বাক্যবিনিময় করে থেমে গেলেন। কিছুক্ষণ পরে মিঃ মুখার্জ্জী মন্তব্য প্রকাশ করল, "মাষ্টার মশাই এ গুমট ভাব ভাল লাগছে না।" মাষ্টার মশাই তক্ষুনি সমর্থন করলেন, "সত্যি একটা কিছু করা দরকার।" মিঃ মুখার্জ্জী তখন আমাকে অর্ডার করল, "মানু, একটা গান ধর দেখি।" উত্তরে বললুম, আজকের এই আবেষ্টনীর মধ্যে যে গান গাওয়া যেতে পারে দুঃখের বিষয় তার আমি দু'ছত্র মাত্র জানি। যদি তাতে রাজি থাক ত আমি তৈরী। উভয়েই উত্তর দিলেন, "তথাস্তু।" আমি ধরলুম :—

গ্রাম ছাড়া ঐ রাঙ্গামাটির পথ
আমার মন ভুলায় রে—

শেষ হতেই মাষ্টার মশাই বলে উঠলেন, "আপনি গান জানেন এ খবর আগে জানা থাকলে এতদিন তা' হলে তা' উপভোগ করা যেত। বে—শ গান হয়েছে।" মিঃ মুখার্জ্জী তাঁকে বাধা দিয়ে বলে উঠল, "এই গানই বেশ? আমি ত ওর চেয়ে ঢের ভাল গান গাইতে পারি।" "তাই নাকি? তবে এবার আপনার গান শোনা যাক্।" সে তখন গলার আওয়াজকে যতদূর কর্কশ করা যেতে পারে তাই করে গান ধরল, :—

"গুরু তোমার অন্ত-ও-ও-ও পাওয়া
ভাঁর—য়্যাঁ—য়্যাঁ—য়্যাঁ—য়্যাঁ—য়্যাঁর"

"মাষ্টারমশাই কেমন শুনলেন ?" তার গানের আওয়াজে আমরা সবাই কানে হাত দিয়েছিলুম। মাষ্টারমশাই এখন কান থেকে হাত নামিয়ে আস্তে আস্তে উত্তর দিলেন, "ভয় করছে।" "ভয় ? ভয় কিসের মশাই ?" "যে গভীর জঙ্গল দু'দিকে, আপনার ঐ মধুর কণ্ঠস্বর শুনে কোন বাঘ যদি তার দোষর ডাকছে মনে করে এসে হাজির হয় ?" মিঃ মুখাজ্জী কৃত্রিম রাগের ভাণ করে বললে, "কি ! আমার গানের এত অপমান ! যান, আর আপনাদের গান শোনাব না।"

বনকে কেন্দ্র করে এখন আমাদের তিন জনের মধ্যে গল্প সুরু হল। ওঁরা বনের বিচিত্র সবুজ রঙের প্রশংসা ও বিভিন্ন গাছ সম্বন্ধে নানা প্রকার আলোচনা করতে লাগ-লেন। আমি বললুম, "এ পথে আমাদের মত অন্তঃসারশূন্য লোকদের আসা উচিত নয়।" 'কেন ?' প্রশ্ন করলে জানালুম, "এই পথ দিয়ে কত লোক গেছে, যাচ্ছে ও যাবে, কিন্তু প্রকৃতির এই অপরূপ রূপের ভাণ্ডার তাদের মনকে নাড়া দিতে পারছে না ও পারবে না, কাজেই অজ্ঞাত

থেকে যাবে। কিন্তু এ পথে যদি কোনও লেখক বা শিল্পী আসতেন, তবে না জানি এ পথের এই সুন্দরী প্রকৃতিকে কেন্দ্র করে লেখনী বা তুলির সাহায্যে কি অপরূপ বস্তুই না সৃষ্টি করতেন—যা' কালের সহস্র আঘাত উপেক্ষা করে যুগ যুগ ধরে মানুষের মনে মাধুর্য্য পরিবেশন করত।" তাঁরা উভয়েই আমার কথা একবাক্যে সত্য বলে স্বীকার করলেন। মিঃ মুখার্জ্জী এরপর চুপ হয়ে গেল, শুধু মাষ্টার মশাই ও আমার মধ্যে আমার মন্তব্য নিয়ে আলোচনা চলতে থাকল। হঠাৎ মিঃ মুখার্জ্জী বলে উঠল, "এক কাজ করলে হয় না ?" আমরা জিজ্ঞাসু দৃষ্টিতে তার দিকে চাইলে সে বলতে সুরু করল, "যখন এপথে কোনও লেখক বা চিত্রকর আসার সম্ভাবনা নেই তখন আমিই না হয় লিখতে সুরু করে দিই ? কি হাসছ যে তোমরা ? আমি লিখতে পারি না মনে করেছ না কি ?" বললুম "বেশ ত লেখনা।" খানিক গম্ভীর হয়ে থেকে সে বলল, "নাঃ, লিখব না।" উৎসুক হয়ে আমরা কারণ জিজ্ঞাসা করলে সে বলল, "কারণ আমার সৃষ্ট বস্তু এত উচ্চাঙ্গের হবে যে তা' আমি ছাড়া আর কেউই বুঝতে পারবে না, কাজেই মুস্কিল।" আমরা উচ্চ কণ্ঠে হেসে উঠলুম।

সন্ধ্যার আগমনে ঝিঁ ঝিঁ পোকার দল সমস্বরে চীৎকার করে নিস্তব্ধ বনভূমিকে মুখর করে তুল্‌ল। অন্ধকার যত ঘন হতে থাকল মাষ্টার মশায়ের বাঘের ভয় তত বৃদ্ধি হতে লাগল। তিনি আমাদের নানাপ্রকার শিকারের গল্প শোনাতে লাগলেন এবং বোঝাতে লাগলেন এমন ঘটনা এখানে ঘটা কিছুই বিচিত্র নয়।

একটানা চলে রাত দশটার সময়ে বনের মধ্যে "খাম্‌পাট" নামে একটি ছোট্ট বস্তীতে আমরা এসে থামলুম। অনিচ্ছায় সকলে লালমাটিপূর্ণ খাবার খেয়ে বিছানায় আশ্রয় নিলুম। গায়ের যন্ত্রনায় প্রাণ এখন অস্থির।

এতক্ষণ গাড়ীর আলোগুলি মিট মিট করে জ্বলছিল, এখন তাও নিবিয়ে দেওয়া হয়েছে। কী ভীষণ কী নিবিড় অন্ধকার বন। কাছের মানুষকেও এখন আর দেখা যায় না। চোখের সামনে সীমাহীন স্তব্ধ আঁধার সমস্ত পৃথিবীকে যেন ঢেকে ফেলেছে। না আছে তার আদি না আছে অন্ত। মনে হচ্ছে যেন চতুর্দ্দিক হতে রুদ্ধ হয়ে পাতালে বাস করছি। গাড়ীতে শুয়ে জলের ঝিম্‌ ঝিম্‌ শব্দ কাণে এলো। বুঝলুম কাছাকাছি কোথাও গতিশীল জলাশয় আছে। অনেক্ষণ পরে বনের অন্ধকার খানিক স্বচ্ছ হয়ে

চাঁদের আগমন সংবাদ জানাল, কিন্তু বহু চেষ্টা করেও তাকে দেখতে পেলুম না, বিরাট বন আমার সামনে পর্ব্বতের মত দাঁড়িয়ে। একটানা অন্ধকারে আমার মন তার কল্পনার গতি হারিয়ে ফেলে সমানে দুঃখময় স্মৃতির পাতা উল্টে চলেছে।

জানিনা কখন শেষ রাত্রের দিকে আমার ক্লান্ত দুটি চোখে নিদ্রাদেবী তাঁর শান্তিময় পরশ বুলিয়ে ঘুম পাড়িয়ে দিয়েছিলেন।

আজ ১০ই মার্চ্চ। তখনও প্রাতের আকাশের বুক থেকে রাতের আঁধার নিঃশেষে মুছে যায়নি। আমার ঘুম ভাঙ্গল সুমধুর বিউগলের শব্দে। কি জানি কোথায় বসে বাদক এমন মধুর সুরে বাজিয়ে চলেছেন। সে সুর প্রাতের নিস্তব্ধ বনভূমিকে সুরের মায়াজালে অপূর্ব্ব করে তুলেছে। ভোর বেলা নিস্তব্ধ স্থানে, গাছপালার মধুর আবেষ্টনীর মধ্যে বসে বিউগল শুনতে যে কত ভাল লাগে ও মনে কত শান্তি দেয় তা' লিখে বা বলে কি বোঝাব। অদেখা বাদকের উদ্দেশ্যে রেখে গেলুম আমার আন্তরিক ধন্যবাদ।

আমরা যত এগিয়ে চলেছি রাস্তার লাল রং তত ফিকে হয়ে আসছে ; বনও এখন আর তেমন ঘন নেই বরং ফাঁকা হয়ে আসছে। চলতে চলতে গাছের ফাঁক দিয়ে দূরে নদী

দেখতে পেলুম। এই নদীতে জলের সাহায্যে চালিত অনেক ঢেঁকি দেখতে পেলুম। নেবে দেখতে চাইলে জানাল যে আমরা যেখানে যাচ্ছি সেখানেও এমন যথেষ্ট আছে।

বেলা দশটা নাগাত আমরা প্রকৃতির স্নিগ্ধ রূপের মাঝ থেকে তার রুক্ষরূপের মাঝে এসে পড়লুম। ধূ ধূ করছে শুভ্র বালির প্রান্তর এবং সেই প্রান্তরকে দু'ভাগে বিভক্ত করে মৃদু গতিতে ও মৃদু গুঞ্জনে বয়ে চলেছে অগভীর নদী। জলের রং শুভ্র এবং তার দুই তীরে ছোট বড় নানা আকারের শুভ্র পাথর রয়েছে। নদীর উপরে সরু কাঠের ব্রিজ দুই তীরকে সংযোগ করেছে।

এখানে এক অদ্ভুত পাখী দেখলুম। মাষ্টার মশাই বললেন যে এমন পাখী নাকি সমুদ্রের ধারে দেখতে পাওয়া যায়। তবে এখানে এলো কি করে? সমুদ্র ত এখান থেকে বহু বহু দূরে।

নদীর তীরে তাঁবু খাটিয়ে বহু যাত্রী রয়েছেন দেখলুম। বেলা এগারোটা নাগাত আমরা তীর হতে বেশ খানিক দূরে পুরান এক কাঠের ছাউনির নীচে আশ্রয় নিলুম। এটি একটি গ্রাম, নাম "ঠেইন্‌জেন।" এবার স্নানের পালা। আমি কুঁড়েমী করে সব শেষে স্নান করতে গেলুম।

জলের ধারে এসে দেখি সত্যিই নদীর ওপারে কয়েকটি ঢেঁকি জলের দ্বারা চলছে। আমি ধীরাকে নিয়ে ওপারে গেলুম। ঢেঁকির সামনেই একটি ছোট্ট কাঠের ঘর। সেই ঘরের ভিতর দিয়ে ঢেঁকির কাছে উপস্থিত হলুম। লক্ষ্য করে দেখলুম ঢেঁকি চলছে অতি সহজ উপায়ে অথচ বেশ আশ্চর্য্যকর।

নদীর জল যদিও খুব ঠাণ্ডা, কিন্তু স্নান করে শান্তি পেলুম না, কারণ অসংখ্য যাত্রী স্নান করে ও শিশুর দল অগভীর জলের উপর লাফালাফি করে তাকে এমন অপরিস্কার করে তুলেছে যে তাতে নাম্‌তেই প্রবৃত্তি হয় না।

কাল বনের মধ্যে গাছপালার আড়ালে ঠাণ্ডায় আরামে কাটিয়েছিলুম, কিন্তু আজ উন্মুক্ত প্রান্তরে উত্তপ্ত বালির মাঝে সূর্য্যের প্রচণ্ড তেজে প্রাণ অস্থির। শোবার স্থান নেই, বসে থাকা অস্বস্তিকর, কাজেই ঠিক করলুম বেড়াব।

আমাদের ছাউনির চারধারে পোড়বাড়ীর চিহ্ন। বোধ হয় আগে এস্থানে কোনও প্যাগোডা বা প্রাসাদ ছিল, এখন পড়ে রয়েছে শুধু তার ধ্বংসাবশেষ। কতক্ষণ ত সেই স্থানে লক্ষ্যহীন ভাবে বেড়ালুম। তারপর গেলুম নদীর ধারে।

বেলা সাড়ে ছটার সময়ে বৈকালিক চা পান সেরে সকলে গাড়ী নামক জেলখানায় উঠলুম। তপ্ত পৃথিবীর বুকে ঝরে পড়া সূর্য্যের স্নিগ্ধ স্বর্ণরশ্মির মধ্যে দিয়ে আমাদের গাড়ীগুলি নানাপ্রকার রাগ ভাঁজতে ভাঁজতে এগিয়ে চলল।

যতদূর দৃষ্টি যায় শুধু সাদা ধপ্‌ধপে বালি আর বালি। সেই বালির উপর দিয়ে কত গাড়ী চলে গেছে আর পিছনে ফেলে রেখে গেছে কত বিচিত্র রেখা। সূর্য্যের আলোয় সকালে যে বালির প্রান্তর হীরার মত ঝক্‌ঝক্ করছিল এখন সন্ধ্যার আগমনে তা' ম্লানরূপ ধারণ করেছে। ক্রমে দূরে পাহাড়ের মাথায় ও গাছের ফাঁকে আঁধার ঘনিয়ে উঠল ও এক সময়ে বহুরূপী আকাশ সোনার বুটি তোলা কালো কাপড়ের আড়ালে আত্মগোপন করল। স্বচ্ছ নদীর জল আকাশের সেই রূপ চুরি করে হয়ে উঠল বিচিত্ররূপিণী।

করুণ কলরব করতে করতে আমাদের গাড়ীগুলি নিস্তব্ধ প্রান্তরের মাঝ দিয়ে নরম বালি ভেঙ্গে এগিয়ে চলল। মাঝে মাঝে ভারতগামী কুলিদের দেখা পাচ্ছিলুম।

রাত এগারোটার সময়ে আমরা "সুন্‌লি" নামে এক বর্দ্ধিষ্ণু গ্রামে এসে পেঁাছলুম। এখানে এসে শুনলুম

ডি, সির নাকি হুকুম যে মুন্‌লি থেকে কোনও লোক তিন দিনের মধ্যে "টামু" যেতে পারবে না, কারণ সেখানে বড় কলেরা হচ্ছে। আমাদের মাথায় ত আকাশ ভেঙ্গে পড়ল। পরামর্শ করে ঠিক হল যে আজ রাতে খাওয়া সেরে ঘুম দেওয়া যাক, কাল সকালে ব্যবস্থা করা যাবে। লালমাটির পরিবর্ত্তে আজ সাদা বালিপূর্ণ খিচুড়ীর সৎকার করে গাড়ীতে রাত্রির জন্য আশ্রয় নিলুম।

এস্থানে বহু গ্রামের লোক ও টিম্‌টিমে কেরাসিনের আলো চোখে পড়ল। এখানকার গ্রামবাসীদের মনেও যুদ্ধের ভয়াবহতা এখন রেখাপাত করতে পারেনি, সে জন্য তাদের দেখে বেশ ভাল লাগল। কিন্তু যুদ্ধের ভয়ে যে স্থান থেকে পালিয়ে এলুম সেখানকার অবস্থা এখন কেমন কে জানে—লক্ষ্ণ ত্যাগ করবার পর থেকে শত্রুকবলিত ও আক্রান্ত অংশের আর কোনও খোঁজ খবর পাইনি। পিছনে ফেলে আসা স্থান ও তথাকার পরিচিত অধিবাসীরা আমার ক্লান্ত চোখের সামনে ভিড় করে দাঁড়াল ও আমার মনকে ব্যথায় ভরিয়ে তুলল।

পরদিন ১১ই মার্চ্চ। সকাল থেকে অনেক ঘোরাঘুরি করে সেদিন বিকালে টামুর উদ্দেশ্যে যাত্রা করবার অনুমতি

আসন্ন প্রসবা স্ত্রীলোক দেখলুম। তাদের বর্ত্তমান ও ভবিষ্যৎ ভেবে আমার কেমন ভয় করতে লাগল।

সে স্থান থেকে আমি কুলিদের ছাউনির কাছে গেলুম। এদের পারিপার্শ্বিক ও দৈহিক অবস্থা আরো শোচনীয়। সবগুলিকে নরকঙ্কাল বললেই হয়। একটি কুলি-বৌ আমায় ছাউনিতে বসিয়ে দুঃখের কাহিনীর সঙ্গে সঙ্গে তার জীবন-ইতিহাস শোনাল। শেষে জিজ্ঞাসা করল, "মাইজী, তোমরা কবে যাবে এখান থেকে?" জানালুম, "আজই বিকালে।" শুনে সে নিঝুম হয়ে গেল।

মন খারাপ হয়ে গিয়েছিল, তাই আমাদের আড্ডায় না গিয়ে গাড়ীতে এসে উঠলুম। কেউ নেই দেখে আমার ডায়েরী নিয়ে দিনের ঘটনা লিখতে সুরু করলুম। খানিক পরে আমার মেয়ে দুটিকে নিয়ে মাষ্টার মশাই এসে হাজির হলেন। আমায় ডায়েরী লিখতে দেখে হেসে বললেন, "ডায়েরী লিখছেন ত? খুব সাবধান কিন্তু। আমরা প্রত্যক্ষদর্শীরা যে আছি সে কথা ভুলে যাবেন না। একটু ভুল লিখেছেন কি সাংঘাতিক কাণ্ড করব, চাই কি কোর্টে নালিশও করতে পারি।" বলে তিনি অন্তর্ধ্যান হলেন। এখন মেয়ে দুটিও ডায়েরীর মাঝে পড়ে আমার প্রাণ অস্থির।

আমি ডায়েরী লিখবই কিন্তু তারা তা' কিছুতেই লিখতে দেবে না। শেষ পর্য্যন্ত আমাকেই আত্মসমর্পণ করতে হল।

বেলা সাড়ে চারটের সময়ে প্রখর সূর্য্যতেজের মাঝ দিয়ে আমাদের গাড়ীগুলি সাদা বালির উপরে বিচিত্র রকমের আল্পনা দিতে দিতে এগিয়ে চলল। এখানে কাছাকাছি ঘন ঘন গাছ পালা দেখতে পেলুম। সেই সব গাছপালার মাঝে মাঝে বর্মীজদের কাঠের ছোট ছোট বাড়ীগুলি ছবির মত লাগছে।

এখন সূর্য্যাস্তের সময়। পাহাড়ের পাঁচিল ঘেরা সবুজ গাছের আবেষ্টনীর মধ্যে সাদা বালির উপরে বসে সূর্য্যাস্ত ও সন্ধ্যার আগমন দেখতে ভারী সুন্দর, ভারী মধুর। প্রভাত ও রাত্রির আগমন ও বিদায় দৃশ্য দেখবার জন্য আমি প্রতিদিন উন্মুখ হয়ে থাকি এবং তা' প্রাণ ভরে উপভোগ করি। সহরেও ত এ দৃশ্য নিত্যকার ঘটনা, কিন্তু স্থান ভেদে সৌন্দর্য্যের আকাশ পাতাল তফাৎ হয়। না দেখলে বুঝিয়ে বলা যায় না যে তা' কত দুঃখহরা ও কত শান্তিঝরা।

রাত ন'টার সময়ে আমরা "উইটোক" নামে একটি ছোট্ট গ্রামে এসে পোঁছলুম। এখান থেকে আমাদের

আজ রাত তিনটার সময়ে যাত্রা করতে হবে, তবে নাকি আমরা কাল যথা সময়ে নির্দ্দিষ্ট স্থানে পৌঁছতে পারব।

গ্রামটি নেহাৎ ছোট্ট এবং কোন বৈচিত্র্য নেই। চারিদিক অন্ধকার; নক্ষত্র খচিত আকাশ সেই অন্ধকারকে খানিকটা স্বচ্ছ করেছে মাত্র। স্বচ্ছ অন্ধকার কাছের বন জঙ্গল ও দূরের পাহাড়কে রহস্যময় করে তুলেছে।

ক্লান্তিতে ভরা একটির পর একটি দিনকে পিছনে ফেলে ভয়াবহ বিপদ হতে যত দূরে এগিয়ে যাচ্ছি ততই মনে স্ফূর্ত্তি হচ্ছে, কিন্তু সেই সঙ্গে সঙ্গে আমার দুর্ব্বল শরীর আরো দুর্ব্বল হচ্ছে। মিঃ মুখার্জ্জীকে এ সম্বন্ধে কিছুই বলতে পারতুম না, কারণ এই সব নানা প্রকার চিন্তা করেই সে বর্মা ত্যাগ করতে একেবারেই রাজি ছিল না। আমিই যুদ্ধের ধ্বংসলীলার ভয়ে তাকে তার অনিচ্ছায় বর্মা ত্যাগ করতে বাধ্য করেছি। শেষ পর্য্যন্ত সে আমার প্রস্তাবে রাজি হলেও মোটেই সন্তুষ্ট ছিল না, সর্ব্বদাই খুঁৎ খুঁৎ করত। আমি দিনের বেলা প্রকৃতির রূপের নেশায় ডুবে নিঃশব্দে কাটাতুম ও প্রায় নিদ্রাহীন দীর্ঘ রাত্রি শুয়ে শুয়ে ভাবতুম যে, কি করে এই দীর্ঘ পথ পার হয়ে পাঁচ হাজার ফিট পাহাড় পর্ব্বত ডিঙিয়ে ভারতে পৌঁছাব। আজকের

নিস্তব্ধ স্বচ্ছ রাত্রিতেও আমি সে চিন্তার হাত হতে নিষ্কৃতি পেলুম না।

রাত সাড়ে তিনটার সময়ে আমাদের গাড়ীগুলি নীরব রাত্রিকে মুখরিত করে তাদের যাত্রা সুরু করল।

আজ ১২ই মার্চ্চ। শেষ রাত্রির আলো-আঁধার মাখান আকাশকে ভারী সুন্দর লাগল, ঠিক যেন ঘুমন্ত শিশুর পবিত্র মুখখানি। আলোর আভাস পেয়ে গাছপালা, পাহাড় পর্ব্বত সব এখন রাত্রির রহস্যের জাল ভেদ করে আত্মপ্রকাশ করছে। এখন একটি ব্যাপার লক্ষ্য করলুম যে, রাস্তায় বা প্রান্তরে শুধু বালিই নয় ছোট বড় নানা আকারের পাথরও রয়েছে। আমরা যত এগিয়ে চলেছি পাথরের সংখ্যা ততই বৃদ্ধি পাচ্ছে। কুড়ি মাইল লম্বা বন ছাড়িয়ে আমরা প্রথম প্রকৃতির রুক্ষমূর্ত্তির সঙ্গে পরিচিত হই। এখন আমাদের অগ্রগতির সঙ্গে সঙ্গে তা' রুক্ষতর হয়ে উঠ্ছে। প্রকৃতির রুক্ষমূর্ত্তির সঙ্গে সূর্য্যের তীব্র তেজ মিতালি পাতিয়ে আমাদের প্রাণ ক্রমে অস্থির করে তুলছে। ছড়ান পাথরের উপর দিয়ে গাড়ীশুদ্ধ আমরা নাচ্‌তে নাচ্‌তে ও গায়ের যন্ত্রণায় প্রায় কাঁদতে কাঁদতে বেলা ন'টার সময়ে সমতল

ভূমিতে বয়ে যাওয়া ঝর্ণার জলের উপর দিয়ে "কাস্তা" নামক গ্রামে গভর্ণমেণ্ট নির্ম্মিত ছাউনিতে পৌঁছলুম।

গাড়ী থেকে নেমে আমার প্রথম কাজ হল বয়ে যাওয়া জলের সঙ্গে মিতালি পাতান। আমি তার ধার দিয়ে দিয়ে অনেক দূর পর্য্যন্ত এগিয়ে গেলুম। জল কাছাকাছি কোথাও এক হাঁটুর বেশী গভীর দেখলুম না। ছোট বড় নানা আকারের ও নানা রঙের পাথরের উপর দিয়ে জল কি সুন্দর লাফিয়ে লাফিয়ে এবং কত রকমের আবর্ত্ত সৃষ্টি করতে করতে ছুটে চলেছে দেখলে মন ভুলে যায়। সূর্য্যের কিরণস্নাত গতিশীল জলকে মনে হয় যেন ঠিক লক্ষ্য লক্ষ্য বরফের শিশু কলহাস্যে সেই স্থান মুখরিত করে কাকে ফাঁকি দিতে কোথায় যেন পালিয়ে যাচ্ছে,—ভারী সুন্দর, ভারী চমৎকার।

ঠিক হল প্রথমে আমরা মুখ ধুয়ে জলযোগ সারব, স্নান হবে পরে। মুখ ধুয়ে এসে দেখি হৈ হৈ ব্যাপার। কারণটি তবে খুলেই বলি। এস্থানে গভর্ণমেণ্ট থেকে রাস্তার ধারে কয়েকটি অস্থায়ী দোকান করা হয়েছে সেখানে চা, চিনি, বিস্কুট, মাখম ইত্যাদি ইত্যাদি পাওয়া যায়। সেগুলিকে বিনা পয়সায় ভোগ করবার অধিকার শুধু

ইউরোপীয়ান ও অ্যাংলো-ইণ্ডিয়ানরা লাভ করেছিলেন, দুর্ভাগা ইণ্ডিয়ানরা তা' পয়সা দিয়েও ভোগ করতে পারবে না তা' তারা সেগুলির অভাবে মরুক, বাঁচুক বা যাই হোক না কেন। ছোট্ট কুম্‌কুম্‌ দোকানে তার পছন্দসই বিস্কুট দেখে আব্দার ধরল যে, সে ঐ বিস্কুট খাবে। আমাদের গবর্ণমেণ্টের ব্যাপার জানা ছিল না, শুনে ত আমরা হতবাক্‌ হয়ে গেলুম। শত অনুরোধেও এবং ভাল দামের লোভ দেখিয়েও যখন দোকানীর কাছ থেকে একটি বিস্কুটও আদায় করা গেল না তখন কুম্‌কুম্‌ তারস্বরে কান্না ধরল। অনেক বুঝিয়ে আমাদের সঙ্গে আনা বিস্কুট দিয়ে শিশুকে শেষে ঠাণ্ডা করা হল, কিন্তু অপমানে ও গ্লানিতে আমাদের মাথা মাটির সঙ্গে মিশিয়ে গেল। কী অবিচার!

সব জায়গার মত এখানেও ছাউনির অতি দুরবস্থা, সেই সঙ্গে ভারতীয়দেরও।

খানিক পরে প্রায় পঞ্চাশ জন অ্যাংলো ইণ্ডিয়ান স্ত্রীলোক এলেন। দু'জন মিলিটারী অফিসারকে রক্ষীরূপে দিয়ে গবর্ণমেণ্ট থেকে তাঁদের ভারতে পাঠান হচ্ছে। যাবার সময়ে তাঁরা দোকানগুলিতে বিনা পায়সায় চা ও বিস্কুট

ইত্যাদি ধ্বংস করলেন। পরে বর্মা ত্যাগকারী ভারতীয়দের দুর্দ্দশার জন্য অনেক দুঃখ প্রকাশ করলেন ও মিথ্যা খবর দিয়ে গেলেন যে, জাপানীরা রেঙ্গুন অধিকার করে সহরের প্রত্যেকটি বাড়ী নাকি ধূলিসাৎ করে দিয়েছে। বলা বাহুল্য রেঙ্গুনে বহু ভারতীয়দের নিজেদের বাড়ী। এই সংবাদ প্রত্যেক ছাউনিতে আগুনের মত ছড়িয়ে পড়ে তাদের ক্ষিপ্ত করে তুল্‌ল।

নিদারুণ সংবাদ ও প্রতিকূল আবহাওয়া আমার চোখে জল এনে দিল। আমি ছুটে জলের ধারে পালিয়ে গেলুম। কী বীভৎস ব্যাপার এই সুন্দর পৃথিবীর বুকে। জলের মধ্যে পা ডুবিয়ে আমি ছোট মেয়ের মত কেঁদে ফেল্‌লুম।

ছাউনিগুলির গুঞ্জন আগের চেয়ে কমে গেলেও আমি জলের ধার থেকে উঠলুম না। অনেকে আমায় ডাকতে এলেন ও শেষে ব্যর্থ হয়ে ফিরে গেলেন। কি জানি মন যেন কেমন হয়ে গিয়েছিল।

ক্রমে প্রকৃতির কোমল স্পর্শে আমার মনের গুঞ্জনও প্রথমে কোমল হল ও শেষে থেমে গেল। জলের মধ্যে সূর্য্য কিরণের রূপালী জালের বিচিত্র খেলা দেখতে দেখতে আমি একেবারে তন্ময় হয়ে গিয়েছিলুম, কাজেই কখন যে

প্রান্তের রক্ত রবি পূব আকাশ বেয়ে মধ্য গগনে হীরক খণ্ডের মত দীপ্ত হয়ে উঠেছে বুঝতেই পারিনি।

বোধ হয় বেলা দেড়টার সময়ে মিঃ মুখার্জ্জী ও তার সঙ্গে বড় ও ছোট মিঃ কাওয়াসজী জাহাঙ্গীর এলেন। মিঃ মুখার্জ্জী এসেই আমায় প্রশ্ন করল, "আচ্ছা, তুমি কাঁদলে কেন বলত? কাঁদার কি কারণ ঘটল?" সে কথা শেষ করতে না করতেই ছোট মিঃ কাওয়াসজী জাহাঙ্গীর বলে উঠলেন "দিদি, আপনি ভারী ছেলে মানুষ কিন্তু, এত সহজে কাঁদেন?" আমি কারুর কথারই কোন উত্তর না দিয়ে স্নানের জন্য তাদের সঙ্গে জলের বুকে গিয়ে পড়লুম।

ছাউনিতে ফিরে যেতে আমার কিন্তু ভারী ভয় করতে লাগল। কি জানি কি আবার হবে এবং তার ক্রিয়া আমার মনের উপর কেমন রেখাপাত করবে ইত্যাদি। কিন্তু পৌঁছে দেখি বিপরীত। সবাই তখন শান্ত হয়ে গেছেন। বৃদ্ধ মিঃ কাওয়াসজী জাহাঙ্গীর আমাদের হাসি মুখে অভ্যর্থনা করলেন।

লঞ্চ ত্যাগ করবার পর থেকে আমাদের খাওয়ার ব্যবস্থা লোভনীয় ত নয়ই বরং কষ্টকর। আজ খাওয়ার ব্যবস্থা চরমে উঠল কারণ সঙ্গের ডাল তরকারী সব নিঃশেষ হয়ে গেছে।

আমাদের ছাউনির পাশ দিয়ে এক বিরাট গাছ আকাশকে স্পর্শ করবার বাসনায় বহু ঊর্দ্ধ পর্য্যন্ত উঠে তার সহস্র বাহু চারিপাশে মেলে দিয়েছে। তার উঁচু গুঁড়ির উপরে দিব্যি আরামে বসা যায় ও আশপাশের ছাউনিগুলি, দূরে বয়ে যাওয়া জল, বহু দূরে আকাশের বুকে হেলান দেওয়া পাহাড়, তাদের কোলে সবুজ বন ইত্যাদি সব বেশ ভাল দেখা যায়। খাওয়ার পর আমি তার উপর আসন নিলুম।

সুনলির চেয়ে এখানে ছাউনির সংখ্যা কম এবং যাত্রীদের সংখ্যা আরো কম, কারণ ভারতগামী যাত্রীদের সেখানে আটকান হচ্ছে, তাই সেখানে জনারণ্যের সৃষ্টি হয়েছে। দুপুরের খাওয়া সেরে ক্লান্তিতে সবাই ঘুমিয়ে পড়েছে। শোবার জায়গা পেয়ে আমাদের সঙ্গীদেরও সেই অবস্থা।

এখন চারিদিক এত নিস্তব্ধ যে গাছের গুঁড়ির উপর বসে আমি জলধারার শব্দ স্পষ্ট শুনতে পাচ্ছি ও জলের উপরে অসংখ্য প্রজাপতির রঙের খেলা বেশ উপভোগ করছি। অন্যান্য স্থানে পাহাড়ের রং ধূসর দেখেছিলুম, কিন্তু এখানে পাহাড়ের রং সবুজ। এর কারণ এখানের

পাহাড়গুলির উপরে গাছ বেশ দেখা যাচ্ছে, অর্থাৎ বুঝলুম আমরা পাহাড়ের বেশ কাছাকাছি এসেছি।

বিকাল বেলা হিন্দুস্থানীদের গরম গরম পুরী ভাজার গন্ধে আমাদের প্রাণ বুভুক্ষিতদের মত অস্থির হয়ে উঠল। কি ভুলই করেছি আমরা সঙ্গে আটা বা ময়দা না এনে। ঠিক হল টামু থেকে ঐ দুটি বস্তু অথবা দুটির একটি নিশ্চয়ই কেনা হবে। আমরা চা, হর্লিক্স, বিস্কুট ইত্যাদি খেলুম আর মনে মনে পুরীর অধিকারীদের নির্ঘাৎ বদ্‌হজমের কামনা জানালুম।

আজ আমাদের ভারী ফুর্ত্তি, কারণ আজ রাত্রে আমরা টামু পৌঁছাব,—যেখানে গিয়ে আমাদের গো-যান ভ্রমণ শেষ হবে ও পাহাড়ে পায়ে হাঁটা শুরু হবে। চারদিন পরেই আমরা ভারতে পৌঁছাব, কাজেই সাজ সাজ রব পড়ে গেল।

হৈ হৈ করতে করতে বেলা পাঁচটার সময়ে গাড়ীতে উঠলুম। আর কয়েক ঘণ্টা পরেই এই গাড়ীতে চলা ও তাতে বাস করার হাত হতে নিষ্কৃতি পাব ভেবে মন শান্তিতে ভরে গেল। আর গাড়ীর ঝাঁকুনিতে গায়ে ব্যথা হবে না, রাত্রিতে পা গুটিয়ে অল্প স্থানে কষ্ট করে শুতে হবে না ও আর বালি

ভরা খাবার চোখের জল ফেল্‌তে ফেল্‌তে খেতে হবে না। কি মজা!

গাড়ীগুলি কচি শিশুর মত কাঁদতে কাঁদতে ছাউনি পিছনে ফেলে জল ডিঙিয়ে জলশূন্য পাথর ছড়ান সাদা বালির প্রান্তরে এসে আঁকা বাঁকা রাস্তা ধরে এগিয়ে চলল। ভূমির উপরে আজ শেষ বারের মত সূর্য্যাস্ত দেখবার জন্য আমার মন উন্মুখ হয়ে উঠল। এর পরে দেখব পাহাড়ের উপরে। না জানি তা কত সুন্দর কত মনোরম দেখতে হবে।

আমাদের এগিয়ে চলার সঙ্গে সঙ্গে আকাশের বুকে রঙের খেলা সুরু হল। এক সময়ে রামধনু রঙের আকাশ ম্লানরূপে রূপান্তরিত হল ও সুরু হল আলোছায়ার লুকো-চুরি। স্বল্প আঁধারে ঝাপসা বন, পাহাড় ও ম্লান বালির প্রান্তর ভেদ করে আলোছায়াব মাঝ দিয়ে চল্‌তে চল্‌তে মন যেন কেমন উদাস হয়ে যায়। বিচিত্র রেখায় ভূষিত পিছনে ফেলে আসা পথের দিকে চেয়ে মনে হয় কি যেন এক পরম প্রিয়তম বস্তু পিছনে ফেলে এলুম যা' বোধ হয় শত চেষ্টায় ও শত অশ্রুপাতেও আর ফিরে পাব না। পৃথিবীর দিকে চেয়ে মনে হয় তার এখনকার এই সাদা,

সবুজ ও ধূসর রঙের সঙ্গে আমার মন যেন মিলে মিশে একাকার হয়ে গেছে। কি এক অদ্ভুত করুণ অনুভূতি আমায় যেন ভেতরে ভেতরে অস্থির করে তুলল।

আমরা যখন টামু নামক স্থানে এসে পৌঁছলুম তখন রাত সাড়ে আটটা। আগেই খবর পেয়েছিলুম যে টামুর ছাউনি থেকে ভারতগামী লোকদের ধীরে ধীরে ছাড়া হচ্ছে। ছাউনিতে গেলে আমরাও আট্‌কা পড়তে পারি এবং তাতে আমাদের ভারতে যাওয়ার দেরী হয়ে যেতে পারে ভেবে আমরা আগে থাকতেই স্থির করেছিলুম যে ছাউনিতে যাব না। খোঁজ পেয়েছিলুম টামুর পোষ্টমাষ্টার মশাই বাঙ্গালী। তাঁর কাছ থেকে কোন স্থানে থাকার সাহায্য পেতে পারি ভেবে আমরা একেবারে পোষ্ট অফিসে এসে হাজির হলুম। মিঃ মুখার্জ্জী ও রায় বাহাদুর রায় পোষ্টমাষ্টার মহাশয়ের নিকট ব্যবস্থার জন্য গেলেন। খানিক বাদে ফিরে এসে জানালেন যে পোষ্টমাষ্টার মশাই আমাদের পোষ্ট অফিস সংলগ্ন তাঁর বাংলোয় স্থান দিতে তৈরী হয়েছেন।

দরজার সামনে দাঁড়িয়ে হাসিমুখে অল্পবয়সী পোষ্ট-মাষ্টার মশাই আমাদের অভ্যর্থনা জানালেন।

বাংলোটি নিতান্তই ছোট। পাশাপাশি তিনটি ঘরের একটি অফিস, একটি চিঠির গুদাম ও একটি তাঁর শোবার ঘর। রান্নাঘর ও বাথ্রুম ইত্যাদি বেশ খানিক দূরে। বাংলোটির চারিধার তার দিয়ে ঘেরা। কম্পাউণ্ডে গাছপালা যথেষ্ট কিন্তু ফুলের নাম গন্ধ নেই। সমস্ত বাংলোটি তিনি আমাদের ব্যবহারের জন্য ছেড়ে দিলেন। শুধু অফিসের সময়টুকু ছাড়া বাকী সময়ে তিনি বাহিরে কোথায় যেন থাকার ব্যবস্থা করলেন আর তাঁর বাড়ীতে আমাদের সুখের রাজত্ব চলল।

চিউইন্দন্ ত্যাগের পর এই প্রথম আমাদের ঘরে শোয়া। আরামে শোয়া গেল বটে, কিন্তু শান্তি পাওয়া গেল না। বাইরে থেকে থেকে আজ ঘরে বড় গরম বোধ হতে লাগল। তা'ছাড়া প্রকৃতির বৈচিত্রময় রূপ হতে বঞ্চিত হয়ে আজ নিদ্রাহীন রাত কাটে কি করে।

১৩ই মার্চ্চ। ঘরগুলির মধ্যে চিঠির গুদামটিই সব চেয়ে বড়। সকালে উঠে দেখি চিঠির গুদামটি মুখ বাঁধা থলে ভর্ত্তি চিঠিতে একেবারে ঠাসা। যে যে জায়গার চিঠি সেই সেই জায়গার নাম কাগজে করে থলিগুলির গায়ে লাগান রয়েছে। কত জায়গার চিঠি যে এখানে জমা রয়েছে তার ঠিক নেই। চিঠির থলিগুলি দেখে আমার

ছোট বেলায় পড়া ও শোনা "ঠাকুরদাদা ও ঠাকুরমার ঝুলির" কথা মনে পড়ে গেল। সেগুলি ছিল গল্পে ভর্ত্তি আর এগুলি নানাপ্রকার হাসি, অশ্রু, আতঙ্ক ও আনন্দ ইত্যাদিতে ভর্ত্তি। এই অযত্নে পড়ে থাকা চিঠিগুলি কত রকমের বার্ত্তা বয়ে নিয়ে যাচ্ছে ভেবে আমার ভারী মজা লাগল। যান-বাহনের অভাবে সেগুলি অমন ভাবে পড়ে আছে। কবে যে গুদাম হতে সেগুলি ছাড়া পেয়ে তাদের আশাপথপ্রার্থী ও প্রার্থিণীদের হাতে পেঁ ৗছবে অথবা আদৌ পৌঁছবে কিনা তা' ভগবানই জানেন।

পোষ্ট অফিসে বাস করার জন্যই না অন্য কোন কারণে জানিনা সকালে চা পান সেরে সবাই চিঠি লিখতে বসলেন। আমারো সখ হল, কিন্তু থলিভর্ত্তি চিঠিগুলির শোচনীয় অবস্থা দেখে ভারতে চিঠি লিখতে আর সাহস হলনা, বর্মার দুজায়গায় দুটি চিঠি দিলুম।

খানিক বাদে রায় বাহাদুর রায়, মিঃ মুখার্জ্জী ও মিঃ রায় তিনজনে হাঁটা পথের সন্ধান ও ব্যবস্থা করতে বেরু-লেন, বৃদ্ধ মিঃ কাওয়াসজী জাহাঙ্গীর অদৃশ্য হলেন, মাসীমা রান্নাঘরে গেলেন আর চিঠির গুদামে বসে আড্ডা দিতে শুধু আমরা রয়ে গেলুম। কি এক অদৃশ্য আকর্ষণে চিঠির

গুদাম থেকে চলে যেতে বাধতে লাগল এবং আমাদের মধ্যে যত প্রকার আলোচনা হল সব শেষকালে চিঠির থলি প্রসঙ্গে এসে সমাপ্তি লাভ করল।

রায় বাহাদুর রায় ও অন্যান্যরা ফিরে এসে আমাদের যে খবর দিলেন তাতে মাথায় আকাশ ভেঙ্গে পড়া যদি সম্ভব হত, তবে তা' বরং ভাল ছিল। তাঁরা খবর নিয়ে এলেন যে টামু থেকে পাহাড়ের পথে ভারতে যাবার ছত্রিশ মাইল দীর্ঘ যে রাস্তা তা' নাকি ১২ই মার্চ্চ থেকে ভারতীদের জন্য বন্ধ হয়ে গেছে। এখন সে পথ দিয়ে শুধু ইউরোপীয়ান ও অ্যাংলো ইণ্ডিয়ানরা যাবেন। আরো শুনলুম যে এই বন্ধ হওয়ার কারণ নাকি ইউরোপীয়ান ও অ্যাংলোইণ্ডিয়ানরা চান না যে, যে পথ দিয়ে তাঁরা যাবেন সেই পথ দিয়ে ভারতীয়রা যায়, কারণ ভারতীয়রা নাকি বড়ই অপরিষ্কার! শুনে ত আমরা হেসেই অস্থির। হাসি থামলে নোংরা ভারতীয় জাতটার জন্য গবর্ণমেণ্ট করুণা করে কি ব্যবস্থা করেছেন খোঁজ করলুম। তাঁরা জানালেন যে টামু থেকে আঠার মাইল দূরে পাহাড়ে ছাপান্ন মাইল দীর্ঘ এক নূতন রাস্তা অভাগা ভারতীয়দের জন্য খোলা হয়েছে, সেই পথ দিয়ে আমাদের যেতে হবে।

এই ঘটনার কিছুক্ষণ পরে রায় বাহাদুর রায় হটাৎ অজ্ঞান হয়ে যান। ডাক্তার এসে পরীক্ষা করে জানালেন যে, তাঁকে সাতদিন শান্ত ভাবে বিছানায় শুয়ে থাকতে হবে, শরীরের অবস্থা অত্যন্ত খারাপ। আমাদের সকলের মন ভীষণ খারাপ হয়ে গেল। প্রথমে ঠিক হয়ে ছিল আমরা সবাই তাঁদের জন্য অপেক্ষা করব, কিন্তু রায় বাহাদুর রায় আমাদের অপেক্ষা করতে বারণ করে যাবার অনুমতি দিলেন। আমাদের মধ্যে যাবার তাড়া পড়ে গেল। মিঃ মুখার্জ্জী ও বড় ও ছোট মিঃ কাওয়াসজী জাহাঙ্গীর গরুর গাড়ীর সন্ধানে গেলেন। মাষ্টার মশাই আটা, ময়দা ও অন্যান্য জিনিষের জন্য ছুটলেন বাজারে। গরুর গাড়ী চারটি পাওয়া গেল, দুটি আমরা ও দুটি কাওয়াসজী পরিবার নিলুম। গাড়ীগুলির ভাড়া পূর্ব্বগুলির চেয়ে বেশী অথচ গঠনে বেশ ছোট। মাষ্টার মশাই আটা বা ময়দা কিছুই পেলেন না।

বিকাল বেলা রায় বাহাদুর রায়েদের ও দুর্দ্দিনের বন্ধু এবং আশ্রয়দাতা পোষ্টমাষ্টার মহাশয়ের নিকট হতে ক্ষুণ্ণমনে ও কৃতজ্ঞ চিত্তে বিদায় নিয়ে গাড়ীতে উঠলুম। টামু ছেড়ে যেতে রায় পরিবার ও পোষ্টমাষ্টার মহাশয়ের কথা বার বার মনে পড়তে লাগল। হাঁটা পথে রায় পরিবার আমাদের

এক প্রকার সহায়ক ছিলেন। এতখানি এসে আমাদের যাত্রাপথের একদল সঙ্গী আমাদের থেকে বিচ্ছিন্ন হলেন। পোষ্টমাষ্টার মহাশয়ের নাম মনে নেই, শুধু মনে আছে তিনি চট্টগ্রাম বাসী।

আবার সেই গরুর গাড়ী, সেই তার ঘড় ঘড় শব্দ ও তার নাচুনির চোটে গায়ের যন্ত্রনা।

টামুর চারিদিকে পাহাড়ের পর পাহাড় ও তাদের গায়ে ঘন বন বেশ দেখা যায়। টামুর ভূমি ছোট বড় নানা-প্রকার পাথরে ভর্ত্তি। আমাদের গাড়ীগুলি এখন সেই পাথর ভেঙ্গে এগিয়ে চলেছে।

খানিক চলার পর আমাদের গাড়ীগুলি জলের ধারে এলো। দু'ধারে প্রায় দশ বার হাত গভীর ছোট বড় পাথরের টুকরার পাড় উপর থেকে গড়িয়ে জলে নেবে গেছে। এখানেও জলের গভীরতা হাঁটু অবধি এবং তা' অতি স্বচ্ছ। দীর্ঘে কত কে জানে কিন্তু প্রস্থে প্রায় চল্লিশ হাত ত নিশ্চয়ই হবে। গাড়োয়ানদের জিজ্ঞাসা করে জানলুম যে ঐ জলের ভিতর দিয়ে আমাদের যেতে হবে। শুনে ত আমার আত্মা খাঁচা ছাড়া হবার যোগাড়। কি করে যে আল্‌গা ও টুকরা পাথরের পাড় দিয়ে দশ হাত নীচে

নাম্‌বে ও আবার তদনুরূপ পাড় বেয়ে গাড়ীগুলি মোটশুদ্ধ উপরে উঠ্‌বে তা' ত আমি ভেবে ঠিক করে উঠ্‌তে পারলুম না। গাড়ীগুলি ঘড় ঘড় করে নীচে নামতে স্থরু করতেই আমি নির্ঘাৎ দুর্ঘটনার আশঙ্কা করে চোখ বুজে ফেললুম, যেন চোখ বুজলেই সব সমস্থার সমাধান হয়ে যাবে। যা' হ'ক আমরা নিরাপদেই ওপার থেকে এপারে এসে উঠলুম। কিন্তু সেই সময়টুকু গরুগুলির ও গাড়ীশুদ্ধ আমাদের ঝাঁকানির চোটে সে কি ভীষণ অবস্থা! মনে হয় যেন আমাদের নাড়ীসহ অন্নপ্রাশনের অন্ন উঠে এলো।

এপারে এসে আবার আমরা বনের মধ্যে পড়লুম। যত আমরা এগিয়ে যাই ততই বনের ঘনত্ব বেড়ে চলে। রাত্রি বৃদ্ধি হওয়ার সঙ্গে সঙ্গে আমরা এক ভীষণ গভীর ও নিস্তব্ধ বনের মধ্যে প্রবেশ করলুম। যাঁরা কখনও বন দেখেন নি তাঁদের কাছে এ এক বিরাট বিস্ময়। কী ঘন এবং কী নিবিড় অন্ধকার এ বন! দেখে মনে হয় যেন বইয়ে পড়া আফ্রিকার জঙ্গলে এসে পড়েছি। বিরাট বিরাট গাছগুলি সব গায়ে গায়ে হয়ে দাঁড়িয়ে আছে এবং তাদের শাখা প্রশাখা আবার এত ঘন যে তার মধ্যে দিয়ে আকাশ দেখবার আর কিছুমাত্র উপায় নেই। এমনি গাছের মাঝে

মাঝে আবার প্রায় দেড় মানুষ লম্বা কি জানি কি জাতীয় ঘাসের বনে ছেয়ে গেছে। পূর্ব্বে যে বনের উল্লেখ করেছি তাতে গরুর গাড়ীর রাস্তা আছে। এ বনে আবার রাস্তা বলে কিছু নেই। সেই ঘন ঘাসের উপর দিয়ে গাছের ফাঁকে ফাঁকে গাড়ী চলেছে, আর লম্বা ঘাস ও গাছের ডালপালা আমাদের গায়ে মুখে এসে পড়ছে। দুর্গম পথ ও নিবিড় অন্ধকারের জন্য গাড়ীগুলি মন্থর গতিতে চলেছে। বনের ভীষণতা দেখে আমরা সবাই চুপ করে বসে রইলুম, শুধু মাষ্টারমশাই একবার কম্পিত কণ্ঠে জানালেন যে এমনি ঘাসযুক্ত বনে বাঘ থাকে, কাজেই আমরা যে একেবারে বাঘের মুখে এসে পড়েছি তাতে আর কোনও সন্দেহ নেই, এখন সব আশা ত্যাগ করে ভগবানের নাম করা যাক্। বাঘ যে কেমন বনে থাকে সে সম্বন্ধে আমার কোনও জ্ঞান নেই, তবে বনের অদ্ভুত ঘনত্ব ও নিবিড় আঁধার আমায় স্তব্ধ করে দিয়েছে। আমার মনে এই চিন্তা উদয় হল যে এমন বনে যদি ডাকাত আসে, তবেআর আমাদের নিস্তার নেই। এতদিন তবু আমরা একত্রে প্রায় ছুশোজন যাত্রী যাচ্ছিলুম কিন্তু আজ যাচ্ছি শুধু কাওয়াসজী পরিবার ও আমরা। ডাকাতের ভয় মনে উদয়

হলেও বনের নিবিড়তা আমায় মুগ্ধ করেছে। কিন্তু খানিক পরে তাও অন্তর্ধ্যান হল।

ক্রমান্বয়ে নিবিড়তর হতে নিবিড়তম বনের মধ্যে নিয়ে যাওয়ায় আমাদের ধারণা হল যে গাড়োয়ানেরা রাত্রির ও বনের অন্ধকারের জন্য নিশ্চয়ই পথ ভুল করেছে। তাই আমরা তাদের বার বার থামতেও অনুসন্ধান করতে অনুরোধ করতে লাগলুম। কিন্তু তারা থামা ত দূরের কথা কেবলই আমাদের বোঝাতে লাগল যে, আর খানিক গেলেই নাকি লোকালয়ে পৌঁছাব।

খানিক পরে হঠাৎ আমরা চতুর্দ্দিক থেকে বনে ঘেরা এক মাঠের মাঝে এসে পড়লুম। বহুক্ষণ পরে মুক্ত স্থানে এসে প্রাণ বাঁচল আমাদের। আমরা আজ এই মাঠে থাকার ঠিক করে গাড়োয়ানদের গাড়ী থামাতে আবার অনুরোধ জানালুম। তারা দু একবার আমাদের কথার প্রতিবাদ করল, তারপর আর কোনও কথা না বলে মাঠ পার হয়ে উর্দ্ধশ্বাসে আবার নিবিড় ঘন বনের মধ্যে প্রবেশ করল।

এখন আমাদের গাড়ীগুলি গভীর বন ভেদ করে ঘড় ঘড় করতে করতে গড়ান রাস্তা দিয়ে নীচের দিকে নেবে

চলেছে। রাস্তা এত সোজা ভাবে নীচের দিকে নেবে গেছে যে গাড়ীতে আমাদের বসে থাকা মুস্কিল, কেবলি মনে হয় এই বুঝি গড়িয়ে পড়ে গেলুম। গাড়োয়ানদের গাড়ী থামানোর জন্য উচ্চ স্বরে বারবার সকলে অনুরোধ করতে লাগলুম, কিন্তু তারা কথাও বলে না বা তেমন চেষ্টাও করে না। মাথার উপর থলে চাপা দিয়ে ঘন বন ভেদ করে যতদূর সম্ভব জোরে যাওয়া যেতে পারে ততদূর জোরে একটানা এগিয়ে চলেছে। আমাদের এখন ভীষণ ভয় করতে লাগল। মাথার উপর থলে চাপা দিয়ে গাড়ী ঠেলে ঐ যে লোকগুলি চলেছে ওরা কে? ভূত? পিশাচ? না ডাকাত? কোথায় কোন পাতালে চলেছি আমরা? সামনে কিছুই দেখতে পারছি না, কেবল গাঢ়তম অন্ধকার চোখের সামনে কুণ্ডলি পাকিয়ে চলেছে,—যেন লক্ষ লক্ষ সাপ। মিঃ মুখার্জ্জী এক সময়ে আমায় আস্তে আস্তে বলল, "দেখছ ত মাসু বর্মা ত্যাগ করার কেমন মজা।" কি উত্তর দেব এর। আমি তখন দু'হাত দিয়ে দুটি মেয়েকে বুকের কাছে টেনে নিয়ে প্রবল ঝড়ের রাতে নীড়হারা পাখীর মত কাঁপছি, মন আমার অবিরাম সর্ব্বশক্তিমানের কাছে মাথা খুঁড়ে চলেছে।

বহুক্ষণ পাতাল যাত্রা করার পর এক সময়ে বন ফিকে হয়ে এলো। আমাদের গাড়ীও এখন সমতলে চলছে দেখতে পেলুম। নীচে গাড়ীর মৃদু আলো ও উপরে আকাশ এখন চোখের সামনে আত্মপ্রকাশ করল। তারপর বোধ হয় আধঘণ্টার মধ্যে গাড়ীগুলি আমাদের একপাশে অনুচ্চ পাহাড় ও একপাশে বনে ঘেরা মাঠের মাঝে এনে নামতে বলল। এটি নাকি একটি ছোট গ্রাম নাম "কোন্‌ডন্‌"। পাঁচটার সময়ে রওনা হয়েছিলুম আর এখন রাত এগারোটা! যা' হোক গাড়ী থেকে নামতে পেয়ে ও লোকজনের সাড়া পেয়ে আমরা মৃত দেহে প্রাণ পেলুম।

আজ আমাদের ভ্রাম্যমান সংসারের ভার আমার উপরে, কিন্তু সংসারের ব্যবস্থা করব কি ক্লান্তিতে ভেঙ্গে পড়ছি। কোন রকমে খাওয়া সারলুম, এবার শোয়ার চিন্তা। কিন্তু গাড়ী যা' ছোট শোয়া হবে কোথা। অর্দ্ধেক শরীর বাইরে ও অর্দ্ধেক ভিতরে করে কোন রকমে গড়ান গেল। কাওয়াসজী পরিবারেরও সেই অবস্থা।

তাড়াতাড়ি ঘুমাবার জন্য চোখ বুজলুম, কিন্তু ঘুমের সাধ্য কি যে কাছে আসে। অসহ্য রকম শরীরের যন্ত্রণায় ঘুমের পরিবর্ত্তে চোখ ভরে ওঠে জলে। ঘুমের আশা ছেড়ে দিয়ে ভবিষ্যতের কথা ভাব্‌তে বসলুম। কাল

আবার গো-যান ভ্রমণ, তবে আশা এই যে কালকেই তা' শেষ হবে। তারপর পাহাড়। পাহাড় আমার খুব ভাল লাগে। শৈশব থেকেই আমার পাহাড় সম্বন্ধে যেমন বিস্ময় তেমনি আগ্রহ। এবার তার সঙ্গে হবে পরিচয়।

আজ ১৪ই মার্চ্চ। সকালে যখন ঘুম ভাঙ্গলে দেখি ভোরের আকাশে তখনও রাতের আঁধার মাখান। গাড়ী থেকে নামতেই দেখি বর্মীজ স্ত্রীলোক ও ছোট ছোট ছেলে মেয়েরা বিস্ময়ভরা দৃষ্টি নিয়ে আমাদের গাড়ীগুলি দেখছে। "ওউক্কনে" শেষ বর্মীজ স্ত্রীলোক ও শিশুদের দেখেছিলুম, তারপর এই দেখলুম। দীর্ঘ দিন যাদের মাঝে জীবন কাটিয়েছি আজ বর্মার শেষ প্রান্তে এসে তাদের দেখতে পেয়ে মন খুসী হয়ে উঠল। রঙীন লুঙ্গি ও সাদা এঞ্জি পরা কয়েকটি মেয়ের সঙ্গে জলের খোঁজে গেলুম।

ছ'টার সময়ে আমরা রওনা হলুম। গতকাল আঠার মাইলের আট মাইল পথ শেষ করেছি, আজ যেতে হবে দশ মাইল, তারপরেই পায়ে হাঁটা।

সকাল বেলা বনের দিকে চেয়ে গত রাত্রের কথা মনে পড়ল। কী নিবিড় ঘন বন আর কি করে তা পার হয়ে এলুম। আশ্চর্য্য যে এত ঘন বনে কোন জন্তু জানোয়ারের

সাড়া পেলুম না, এমন কি ঝিঁ ঝিঁ পোকারও নয়। অবশ্য জন্তু জানোয়ারের সাড়া শব্দ না পেয়ে ভালই হয়েছে, পেলে আমাদের অবস্থা আরো শোচনীয় হত, বিশেষ করে মাষ্টার মশায়ের। এমন বনকে দিনের বেলায় দেখতে না পাওয়ার জন্য মনে আফ্‌সোস্‌ হল।

এখন আমরা গরুর গাড়ীর রাস্তার উপর দিয়ে নূতন রেখার সৃষ্টি করতে করতে এগিয়ে চলেছি। রাস্তার ছু'পাশে বন রয়েছে, কিন্তু তা' মোটেই ঘন নয় আর গাছগুলিও মাথায় ছোট। গাড়ী যতই এগিয়ে চলেছে রাস্তায় বড় বড় পাথরের সংখ্যা ততই বৃদ্ধি পাচ্ছে।

বেলা একটার সময়ে আমরা দশ মাইল রাস্তায় ন' মাইল অতিক্রম করে এমন স্থানে এসে থামলুম যেখানে গরুর গাড়ী অচল। এখানে আর রাস্তা নেই, এমনকি গাছও নেই, যতদূর দৃষ্টি যায় শুধু বড় বড় পাথরের টুক্‌রা ও অদূরে বিরাট বিরাট পাহাড় আকাশ ছুঁয়ে দাঁড়িয়ে আছে। গরুর গাড়ী এইখান থেকে বিদায় নিল। এবার বাকী এক মাইল আমরা পায়ে হেঁটে চললুম। তীব্র সূর্য্য-তেজে উত্তপ্ত উঁচু নীচু পাথরের উপর দিয়ে চলতে প্রাণ অস্থির। কতবার যে সবাই আছাড় খেলুম তার ঠিক নেই।

ঘেমে নেয়ে শেষে "মিন্‌তা" নামক স্থানে যাত্রীদের ছাউ-নিতে তথা নরকে হাঁপাতে হাঁপাতে এসে পোঁছলুম।

মিন্‌তার ছাউনি শ্রীক্ষেত্রে পরিণত হয়েছে। ছোট বড় ইতর ভদ্র সব একাকার—শ্রেণীর চিহ্ন মাত্র নেই। যে যেখানে স্থান করতে পেরেছে সে সেইখানেই বসে পড়েছে। এই প্রকার ব্যবস্থার জন্য অপরিচ্ছন্নতা চরম সীমায় উঠেছে। সমস্ত ছাউনিটি নানাপ্রকার প্রাকৃতিক ও দৈহিক আবর্জ্জনায়, ধোঁয়ায়, রোগীর কাতরাণি ও সুস্থ মানুষের চীৎকারে ভয়াবহ রূপ ধারণ করেছে। তার উপর কলেরা রোগীর ভীষণ অবস্থা দেখে ভয়ে মনে হয় কোথাও ছুটে পালাই।

ছাউনিতে খানিক বিশ্রাম করে প্রথমেই চা-খোরদের চায়ের ব্যবস্থা করতে হল। তারপর রান্না সেরে স্নানের জন্য তৈরী হলুম।

এখানেও কোন দূরবর্ত্তী ঝর্ণার জল সমতলে বয়ে চলেছে। জলের ধারে গিয়ে দেখি যে তাতে কলেরা রোগীদের কাপড় ধোয়া হচ্ছে এবং তা' অতি অপরিষ্কার হয়ে উঠেছে। মিঃ মুখার্জ্জী ঘোর আপত্তি তুলল ও বললে যে সঙ্গে আনা ফোটান খাবার জল দিয়ে মুখ হাত ধুয়ে খাওয়া

সারতে। কিন্তু স্নান না করে এই অপরিষ্কার শরীরে থাকা যায় কি করে। আমরা পরামর্শ করে যে দিক থেকে জল আসছে সেই দিকে উপরে এগিয়ে গেলুম। অনেক দূরে যাবার পর পরিষ্কার জল পাওয়া গেল।

খাওয়া হয়ে গেলে হাঁড়ি বাসন ওঠাতে গিয়ে দেখি আমি যেখানে রান্না করেছি তার থেকে খানিক দূরে এক নেপালী স্ত্রী ও পুরুষ বসে খাচ্ছে। স্ত্রীটির দিকে চেয়ে আমার চোখ ফেরান মুস্কিল হ'ল। মুখ তার পাহাড়ী মেয়েদের যেমন হয়ে থাকে তেমনি, ঝিঁক উঁচু, চ্যাপ্টা নাক, বসা চোক ইত্যাদি। কিন্তু কী তার স্বাস্থ্য আর কী দেহের গঠন! ঠিক যেন কুঁদে কাটা পাথরের মূর্ত্তি, চোখ জুড়িয়ে যায়। আমি ছুটলুম মিঃ মুখার্জ্জীর সন্ধানে এবং এক চমৎকার জিনিষ দেখাবার লোভ দেখিয়ে টেনে আনলুম। সে ত দেখে প্রথমে হেসে খুন, বললে, "এই আবার সুন্দর নাকি? এযে সদ্য খনি থেকে তোলা কয়লা, এ রা—ম!" বললুম, "ও, সাদা চামড়াটাই বুঝি সব? অমন স্বাস্থ্য আর গড়ন বুঝি কিছুই নয়? আমার কিন্তু ওকে ভীষণ ভাল লাগছে।" মিঃ মুখার্জ্জী আর এক চোট হেসে এবার আমায় টেনে নিয়ে গেল।

খাওয়ার পর যখন আমাদের বিশ্রাম ও আড্ডা দুই চলছে তখন একটি কুলি এসে মিঃ মুখার্জ্জীকে জানালো যে তাকে নাকি কোনও মাইজী ডাকছেন। মিঃ মুখার্জ্জী তৎক্ষণাৎ চলে গেল। সে ফিরে আস্‌তে খোঁজ নিয়ে যা' শুনলুম তাতে ত আমি অবাক। কে নাকি এক মাদ্রাজী ভদ্রমহিলা ছোট ছোট বাচ্ছা নিয়ে একা বর্মা থেকে ভারতে চলেছেন। সঙ্গে কোনও পুরুষ না থাকায় কুলির বন্দোবস্ত করে দেবার জন্য তিনি মিঃ মুখার্জ্জীকে ডেকে-ছিলেন। আমি ঠিক করে ফেললুম যে এই বীরাঙ্গনাকে একবার দেখতেই হবে।

বিকাল বেলা আমাদের পাশের ছাউনিতে, আমরা যেখানে জায়গা নিয়েছি তার থেকে মাত্র তিন চার হাত দূরে একটি কুলি কলেরায় আক্রান্ত হল। সে তখন অবিরাম বমি করে চলেছে। সঙ্গে কেউ দেখবার নেই, গভর্ণমেণ্ট থেকেও কোনও ব্যবস্থা নেই।

আমরা সবাই বড় বিচলিত হয়ে পড়লুম। ব্যবস্থা একটা কিছু করতে হবে এবং তা' পালান, অথচ তা' কি করে সম্ভব হবে। এখানের ছাউনিতে এমন লোক বহু আছেন যাঁরা দশ পনরো দিন ধরে বসে আছেন, বর্মা ত্যাগের

পাশপোর্ট পাচ্ছেন না। আমরা আজ এসেই যাবার পাশপোর্ট পাব কোথা থেকে। যদি কিছু উপায় করা যায় এই ভেবে মিঃ মুখার্জ্জী ইভাকুই পাশপোর্ট অফিসে গেল। এদিকে আমরা ছাউনিতে বসে কতক্ষণে কলেরা রোগে আক্রান্ত হ'ব তারই অপেক্ষা করতে লাগলুম।

আমরা জানতুম সবাই যখন যাবার পাশপোর্ট পাচ্ছেন না তখন আমরাও পাব না। কিন্তু হল বিপরীত! মিঃ মুখার্জ্জী পাশপোর্ট নিয়ে এলো। কি করে এ সম্ভব হল জিজ্ঞাসা করলে সে বলল, "আমাদের জানাশোনা এক বর্মীজ ভদ্রলোক 'ইভাকুই পাশপোর্ট' অফিসের একজন অফিসার। তাঁর দৌলতে পাওয়া গেল। আমরা কালই যাব।" আমরা সকলে আরামের নিশ্বাস ফেললুম। কাওয়াসজী পরিবারও পাশপোর্ট পেয়ে গিয়েছেন, কাজেই ঠিক হল আমরা একত্রে যাব।

সন্ধ্যার ধূসর আঁধার পৃথিবীর বুকে ঝরে ঝরে পড়ে যখন তাকে করে তুলল কালোর কালো, তখন আমরা রাতের জলযোগ সেরে বিছানা নিলুম। সমস্ত রাত কিন্তু একটুও ঘুমুতে পারলুম না ;—প্রকৃতির মধুর রূপে আকৃষ্ট হয়ে নয়,

কলেরা রোগীর অবিরাম বমনের শব্দে ও ভয়াবহ রোগের ভয়ে।

আজ ১৫ই মার্চ্চ। ভোর হতেই আমাদের যাবার আয়োজন সুরু হল। অনেক কষ্টে আটজন মণিপুরী কুলি পাওয়া গেল। এক একটির ভাড়া পঁয়তাল্লিশ টাকা করে। আট জনের মধ্যে চার জন মোট বইবে আর চার জন ডুলি। কাঁচা বাঁশ দিয়ে কুলিরা যে ডুলি তৈরী করল তা দেখতে হল ঠিক বাংলা দেশে মড়া নিয়ে যাওয়া পায়া হীন খাটিয়ার মত। অমজবুত কাঁচা বাঁশের ডুলিটি মচ্‌মচ্‌ ও নড়বড় করতে লাগল। কুলিগুলির ঘাড়ে মোট চাপিয়ে খাটিয়ায় বিছানা পেতে মেয়ে দুটিকে বসিয়ে আমায় আহ্বান জানান হল। অমন অমজবুত ডুলিতে বসে আমায় দুর্লঙ্ঘ্য পাহাড় পার হতে হবে শুনে অন্তর শুকিয়ে গেল; তাও আবার ঐ মড়া নিয়ে যাওয়া খাটিয়ার মত যার গঠন! আমি বিদ্রোহ ঘোষণা করলুম, "ও ডুলিতে আমি উঠতে পারব না। এমনই ও পাহাড় পার হতে পারব কিনা সন্দেহ, তার উপর আবার ঐ অমজবুত ডুলিতে উঠে অপঘাতে প্রাণ দিই আর কি। ও সব আমাকে দিয়ে হবে টবে না।" কিন্তু মিঃ মুখার্জ্জীও ছাড়বার পাত্র নয়, বললে, "হতেই হবে, ওঠ দেখি।" "ও

বাবা, আমি উঠতে পারব না, উঁহু''। "কি ছেলে মানুষ তুমি মানু? এখন কি এ শরীরে বাপ্‌রে মারে করবার সময়?" "আমি জলজ্যান্ত মানুষ ঐ মড়ার খাটে উঠতে পারব না।" "তবে তোমায় এখানে ফেলে রেখে যাব কিন্তু।'' অদূরে মাষ্টার মশাই আমাদের কাণ্ড দেখছিলেন আর হেসে খুন হচ্ছিলেন। মিঃ মুখার্জ্জী আমাকে ডুলিতে উঠতে না দেখে এবার মাষ্টার মশায়ের শরণাপন্ন হল, বললে, "দেখুন ত কি পাগলকে নিয়ে চলেছি, ঐ শরীর নিয়ে বলে কিনা ডুলিতে উঠ্‌ব না!" মাষ্টার মশাই কিন্তু শরণাপন্নকে ছেড়ে বিদ্রোহিণীর পক্ষ নিলেন। বললেন, "এখন ত দু'মাইল আমাদের সমতলের উপর দিয়ে যেতে হবে, হেঁটেই চলুন না। তারপর খানিক পাহাড়ে উঠলে নিজেই তখন ডুলিতে উঠতে চাইবেন, আপনি এত ভাবছেন কেন।''

প্রথমে ডুলি বাহকেরা ও কুলিরা মোট নিয়ে চলল। তাদের তাড়া দিয়ে নিয়ে চলল মিঃ মুখার্জ্জী, মাষ্টার মশাই ও আমি রইলুম তার পিছনে।

রাস্তায় যেতে যেতে মিঃ মুখার্জ্জী পূর্ব্বোল্লিখিত মাদ্রাজী ভদ্রমহিলাকে দেখাল। ভদ্রমহিলা দেখতে বেশ, ধপ্‌ধপে

রং, পিঠে বেণী, কপালে রুড়ীর টিপ্‌ তবে পেট একটু বেশী বড়। দেখলুম তিনটি বাচ্ছাকে হাঁটিয়ে ও একটিকে কোলে নিয়ে কুলিদের হট্‌ হট্‌ করতে করতে তাড়িয়ে নিয়ে চলেছেন। তাঁকে দেখে শ্রদ্ধায় আমার মন ভরে গেল। মাষ্টার মশায়ের দৃষ্টি তাঁর প্রতি আকৃষ্ট করে জিজ্ঞাসা করলুম, "সত্যি করে বলুন ত এ দৃশ্য কেমন লাগছে? এই বীরাঙ্গনাটিকে দেখতে ভাল লাগে, না আমাদের মত এই কাপড়ের পুঁটুলিগুলিকে? নৌকায় ত খুব শুনিয়েছিলেন মেয়েরা নাকি কোমলা, অবলা, সরলা ইত্যাদি, এখন দেখছেন ত সুযোগ পেলে তাঁরা কেমন সব দিকদিয়ে উপযুক্ত হতে পারেন।" মাষ্টার মশাই কিন্তু আমার বক্তৃতার ধার দিয়েও না গিয়ে উল্টো আমায় প্রশ্ন করলেন, "আপনার কেমন লাগছে?" "আমার? আমার ত ওঁর পায়ের ধূলো নিতে ইচ্ছে করছে।" মাষ্টার মশাই হো হো করে হেসে উঠলেন।

কখন যে দু'মাইল পথ শেষ হয়ে গেছে বুঝতে পারিনি। সহসা দেখি বিরাট এক দৈত্যের মত পাহাড় আকাশে মাথা ঠেকিয়ে দাঁড়িয়ে আছে। এই পাহাড়ে আমাদের উঠতে হবে। পাহাড়ের সামনে দাঁড়িয়ে চোখ

আমার বিস্ময়ে স্তব্ধ হয়ে গেল আর মন চলে গেল শৈশবের দিনগুলির মাঝে। বিহারে থাকতে যখন বাবার হাত ধরে বেড়াতে যেতুম দূরে পাহাড় দেখে মন আমার বিস্ময়ে ও খুসীতে ভরে উঠত। বলতুম, "বাবা আমায় ওখানে নিয়ে চলনা।" জিজ্ঞাসা করতেন, "কোথায় রে?" "ঐ যে ঐ পাহাড়ে।" "ও যে অনেক দূর রে পাগলী।" "দূরে আবার কোথায়? একটু জোরে হাঁটলেই পোঁছে যাব।" বাবা হাসতেন ও বলতেন "তিন চার দিন হাঁটলেও ওখানে পৌঁছান যাবে না মা।" আমার ভারী রাগ হত, ভাবতুম বাবা বড় ছেলে মানুষ। আমি বড় হলে বাবাকে হাতে ধরে রোজ পাহাড়ে বেড়িয়ে নিয়ে আসব। আমাকে খুসী করবার জন্য বাবা আমায় তাঁর কোলে তুলে নিতেন। আমি অতৃপ্ত নয়নে সবুজ বনে ঘেরা বিরাট ধূসর পাহাড় ও তার বুকে ঢলে পড়া নীল আকাশ দেখতে দেখতে বাড়ী ফিরতুম। আজ বহুদিন পরে বিপদের তাড়নায় তাড়িত হয়ে বহু বিস্ময়ে ভরা ও বহু আকাঙ্ক্ষিত পাহাড়ের পদপ্রান্তে এসে দাঁড়িয়েছি। আমি ধীরে ধীরে তার গায়ে হেলান দিয়ে বসে পড়লুম।

এখানে আবার সেই ডাক্তারের স্ত্রীর সঙ্গে দেখা হল।

আমায় দেখে জিজ্ঞাসা করলেন, "আপনি কি হেঁটে চলেছেন নাকি ?" আমি সেই রকম ইচ্ছা জানালে বললেন, 'আপনি এমন রোগা পাত্‌লা মানুষ পাহাড়ের পথে হাঁটবেন কি করে ?' উত্তরে হাসলুম।

পাশপোর্ট দেখান এবং পরীক্ষা হলে আমরা পাহাড়ে উঠতে সুরু করলুম। পাহাড়ে এখন বসন্তের আগমনে সাজ সাজ রব পড়ে গেছে। ছোট ছোট থেকে আরম্ভ করে বড় বড় শুকনা পাতায় পাহাড়ের গা ঢেকে গেছে ও তার মর্ম্মর ধ্বনিতে পাহাড় মুখরিত হয়ে উঠছে। বড় বড় গাছের মধ্যে শাল গাছই বেশী। এখন সেগুলি ও অন্যান্য ছোট বড় সব গাছ সবুজ পাতার নূতন পোষাক পরেছে। পাহাড়ের গা বেয়ে এখন আমরা যে রাস্তা ধরে চলেছি তা ভীষণ চড়াই ও তার রং লাল। রাস্তা সে নামেই এবং এমন সাংঘাতিক যে আমরা খানিক উঠে পাঁচ ছ'মিনিট করে বিশ্রাম নিয়ে তবে আবার হাঁটতে পাচ্ছিলুম। এই ভাবে এক ফার্লং ওঠার পর কুলিরা জানাল যে, এর আগে কাছাকাছি জল পাওয়া যাবে না। কাজেই এখানে রান্না খাওয়া শেষ করে নাও।

ঘণ্টা খানেক পরে আবার হাঁটতে সুরু করে শুনলুম

যে বৃদ্ধ মিঃ কাওয়াসজী জাহাঙ্গীর যে ডুলি করে যাচ্ছিলেন তার চারজন বাহকের একজন সর্দ্দিগর্ম্মি হয়ে এই মাত্র মারা গেছে। মৃত দেহকে দাহ করতে হবে বলে বাকী তিন জনও আর যেতে পারবে না। মহামুস্কিলে পড়লুম। বহু আলোচনা পরামর্শের পর আমাদের ডুলি থেকে লীনাকে নামিয়ে কুলির পিঠে দেওয়া হল ও ধীরার সঙ্গে বৃদ্ধ সেই ডুলি করে চললেন।

আবার আমাদের চলা সুরু হল। এমনিই ত উঠতে কষ্ট হচ্ছিল, এখন খাওয়ার পর আরো কষ্ট হতে লাগল। পাহাড়ের গা ধরে ধরে প্রায় হামাগুড়ি দিয়ে আর এক ফার্লং উঠে দেখি যে সামনে এক বিরাট পাহাড় সোজা আকাশে উঠে গেছে। আমার আগেই মিঃ মুখার্জ্জী ও মাষ্টার মশাই উঠে গিয়েছেন। আমি ধীরে ধীরে উঠছিলুম। আমাকে দেখেই মিঃ মুখার্জ্জী আঙ্গুল দিয়ে সামনের বিরাট পাহাড় দেখিয়ে বলল, "সামনে ওটি কি দেখছ ও মানু ? ওটির উপর উঠতে হবে আর তাই করতে গিয়ে তুমি এবার নির্ঘাৎ মারা যাবে।" বললুম, "উত্তম প্রস্তাব, অভাগার ঘোড়া মরে ভাগ্যবানের বৌ মরে।" সে ত দুর্গম পথ দেখে এমনিই চটে ছিল, এখন আমার কথায় আরো খানিক চটে চুপ করে এগিয়ে চলল।

সামনে বিরাট পাহাড়ে ওঠার আগে এক ঘটনা ঘটল। খানিক এগিয়ে দেখি কি একটি নেপালী যুবক শুয়ে আছে আর তার নিকটে সিঁড়ির ধাপের মত পর পর তিনটি শিশুকে নিয়ে একটি নেপালী যুবতী বসে আছে। কাছে গিয়ে দেখি যুবকটি মারা গেছে। কি হয়েছে জিজ্ঞাসা করলে বৌটি জানাল যে যুবকটি ঘুমাচ্ছে, বলেছে খানিক পরে উঠে তাদের নিয়ে যাবে। মিঃ মুখার্জ্জী বাংলায় বলল, "আর নিয়ে গেছে।" তারপর আমার দিকে ফিরে বললে, "কই গো ভাগ্যবানের বৌ, খুব ত এতক্ষণ বক্তৃতা দিচ্ছিলে, দেখছ ত এখন তার বিপরীত ঘটনাও ঘটতে পারে, অর্থাৎ তুমি ভাগ্য * * *।' "সর্ব্বনাশ ! চুপ চুপ।" "কেন ? চুপ কেন ? উত্তর দাও।"আমি তার কথার উত্তর না দিয়ে বললুম, "চল এখান থেকে।" আমার মন থেকে সব আগ্রহ অদৃশ্য হয়ে গেছে ও চোখের সামনে সৌন্দর্য্যময়ী পৃথিবী নিকষ কালো ধোঁয়ার রূপ ধারণ করেছে। কেবলি মনে হতে লাগল কীভীষণ ব্যাপার ! নেপালী যুবতীটির জন্য যেমন কষ্ট হতে লাগল তেমনি তার দুর্ভাগ্যের কথা ভেবে মনের মধ্যে কি যেন এক অদ্ভুত ব্যথা অনুভব করতে লাগলুম। ভগবানের কাছে প্রার্থনা জানালুম যে সবকটি প্রাণ নিয়ে যেন ফিরে যেতে পারি।

সামনের পাহাড়ে ওঠবার আগে আমাদের হাতে একটি করে পাত্‌লা বাঁশ লাঠির মত ছোট করে ভেঙ্গে দেওয়া হয়েছিল। লাঠির সাহায্যে আমরা পাহাড় ভেঙ্গে চলেছি। বহু যাত্রী ও যাত্রিণী চলেছেন। সবায়ের হাতে একটি করে লাঠি আর কুলি থেকে আরম্ভ করে সবায়ের মুখে ক্লান্তি জনিত হুঁম্ হুঁম্ শব্দ।

দ্বিতীয় পাহাড়টির রাস্তা আবার ভীষণ চড়াই। সবাই আট দশ হাত এক সঙ্গে উঠে পাঁচ মিনিট করে বিশ্রাম নিচ্ছে। এই পাহাড়ে খানিক উঠে মিঃ মুখার্জ্জী আর একবার আমার নির্ঘাৎ মৃত্যু ঘোষনা করল ও জিজ্ঞাসা করল কেন আমার বর্মা ত্যাগের মতি হয়েছিল। এই পাহাড় ভেঙ্গে ভারতে যাওয়ার চেয়ে নাকি জাপানীদের হাতে মরা ঢের ভাল ছিল ইত্যাদি ইত্যাদি।

খানিকক্ষণ আমরা সবাই চুপ চাপ। মিঃ মুখার্জ্জীই এক সময়ে বলতে সুরু করল, "কি করা যায় বলুন ত মাষ্টার মশাই? এই পাহাড় ডিঙিয়ে যাওয়া ত অসম্ভব, আবার বর্মায় ফিরে যাবারও ত কোনো পথ নেই।" পাহাড়ের বিরাট বপু দেখে ও পথকষ্টে মাষ্টার মশাইও ভেঙ্গে পড়েছিলেন। শুষ্ক কণ্ঠে বললেন, "নাঃ, বর্মায় ফিরে যাবার ত আর কোনও

উপায় নেই।" সবাই বসে ভাবছি কি করা যায়, কিন্তু করবার কিছুই নেই, কাজেই পাহাড়ের গায়ে খাড়া উঠে যাওয়া রাস্তা ধরে প্রায় হামাগুড়ি দিয়ে উপরে উঠতে লাগলুম। অনভিজ্ঞতা, ভয় ও গুরুতর পথশ্রমে সর্ব্বশরীর কাঁপতে লাগল। নিশ্বাস-প্রশ্বাসের সময়ে মনে হয় কে যেন গলা টিপে ধরেছে।

আমরা নিঃশব্দে উপরে উঠ্‌ছিলুম। সে সময়ে কথা বলবার মত উৎসাহ বা শক্তি কারুরই ছিল না।

দুপুর নাগাত আমরা বহু পাহাড় ঘুরে ঘুরে একটু ভাল রাস্তা পেলুম। ভাল রাস্তায় এসে সকলের মুখ ফুটল। প্রথমে কথা বলল মিঃ মুখার্জ্জী, "দেখ মাম্নু, আমার মনে হচ্ছে আমি যেন মহাপ্রস্থানের পথে চলেছি। যাক্ ফিরে গিয়ে 'মহাপ্রস্থানের পথে' নাম দিয়ে তোমাদের জন্য অনুরূপ অমর গ্রন্থ রচনা করব, কি বল?" বললুম, "তাত হল কিন্তু রাণী কই?" সে তখন মাথায় হাত বুলিয়ে বলল, "তাও ত বটে।" তারপর বিমর্ষ ভাবে বলল' "তবে আর অমর গ্রন্থ রচনা করা হল না।" আমরা হেসে উঠ্‌লুম।

আমাদের রাস্তার দু'পাশে ঘন বন, তার মধ্যে বাঁশ ঝাড়ই বেশী। রাস্তায় দাঁড়িয়ে উপরের মানুষগুলিকে পাখী

ও নীচের জমিকে খেলাঘর বলে মনে হয়। দূরে বর্মা দেশের সমতলের কিছু কিছু এখনও দেখা যাচ্ছে, কিন্তু সেগুলি অত্যন্ত ছোট ছোট ও যেন ধূমাচ্ছন্ন। দীর্ঘ দিনের স্মৃতি বিজড়িত দেশকে পিছনে ফেলে যেতে অব্যক্ত বেদনায় মন ভেঙ্গে পড়তে লাগল, কেবলি মনে হতে লাগল কি যেন এক অতি আদরের বস্তুকে হারিয়ে এলুম যা' কোনো দিন আর আমার হবে না।

এই পাহাড়ে চলতে চলতে এক অদ্ভুত অথচ করুণ আওয়াজ আমাদের কানে এলো। দেখলুম আমাদের অগ্রগতির সঙ্গে সঙ্গে সে আওয়াজ বৃদ্ধি পাচ্ছে। কাছা-কাছি এসে দেখি একটি কুলি আধশোয়া অবস্থায় খোঁনা স্বরে "জল দাও জল দাও" বলে চেঁচাচ্ছে। কি রোগে সে আক্রান্ত তা' আর বুঝতে বাকী রইল না। আকণ্ঠ জল পান করাতেই সে কঠিন পাথরের বুকে চিরতরে ঢলে পড়ল। আরো খানিক এগিয়ে যেতে আর একটি কুলিকে মৃত অবস্থায় দেখলুম। ভয়ে আমাদের প্রাণ শুকিয়ে গেল। কেবলি মনে হতে লাগল সব কটি প্রাণ নিয়ে কতক্ষণে ভারতে পৌঁছাব। সন্ধ্যা পর্য্যন্ত আমরা পাঁচটি মৃত দেহ দেখলুম।

সূর্য্য যখন পশ্চিম আকাশে ঢলে পড়েছে আর তাঁর

দীপ্তিহীন আলো তির্য্যক ভঙ্গিতে পাহাড়গুলির গায়ে এসে পড়েছে তখন আমরা আর একটি গগনচুম্বী পাহাড়ের পদ-প্রান্তে এসে পৌঁছলুম।

এখনও আমরা আমাদের বিশ্রামের স্থানে এসে পৌঁছয়নি, আবার চড়াই ভেঙ্গে পাহাড়ে উঠতে হবে ভেবে মন খারাপ হয়ে গেল। তৃষ্ণায় প্রাণ অস্থির, কিন্তু সঙ্গে আনা জল এখন ফুরিয়ে এসেছে। যে কুলিটি আমাদের কোটান খাবার জল বহন করছে সে অনেক দূরে এগিয়ে গেছে যেহেতু সে আমাদের সঙ্গে আস্তে আস্তে চলতে নারাজ।

খানিক পাহাড়ে উঠে দেখি বড় ও ছোট মিঃ কাওয়াসজী জাহাঙ্গীর বিশ্রাম করছেন। আমরাও বিশ্রাম নিলুম। কি জানি আরো কতদূর যেতে হবে। কুলিদের জিজ্ঞাসা করলে কেবলি বলে যে শেষ হয়ে এলো আর দেরি নেই। ক্লান্তি ও যন্ত্রনায় শরীর ভেঙ্গে পড়ছে, ইচ্ছা হচ্ছে না যে আর এক পা এগুই। মনে হয় এইখানে এই কঠিন পাথরের উপর শুয়ে পড়ি, তারপর যা' আছে অদৃষ্টে তাই হোক। কিন্তু শোয়া ত দূরের কথা বেশীক্ষণ বসবারও উপায় নেই অমনি কুলিরা তাড়া দেয় "চল, চল, চল।"

আজ পাহাড়ে বসে সূর্য্যাস্ত দেখলুম যা' ভূমির চেয়ে বহু অংশে সুন্দর ও মনোরম লাগল। সমস্ত পশ্চিম আকাশ অস্তরবির বিদায়স্পর্শে লাল টুকটুক্ করছে, যেন সেখানে ভীষণ অগ্নিকাণ্ড সুরু হয়েছে। সূর্য্যের রক্তাভ রশ্মি সহস্র ভাগে বিভক্ত হয়ে সবুজ ভেলভেট মোড়া পাহাড়গুলির উপর অবিরাম আবির বর্ষণ করে চলেছে।

সন্ধ্যা সাড়ে সাতটার সময়ে পাহাড়ের উপরে গভীর জঙ্গলে জলের নিকটে আমরা বিশ্রামের জন্য থামবার অনুমতি পেলুম। আমার ধারণা ছিল যে পাহাড় মানেই সেখানে বহু ঝর্ণা থাকবে। আমি ঝর্ণা খুব ভাল বাসি বলে তা' দেখবার জন্য আমার উৎসাহের সীমা ছিল না। কিন্তু আজ পাহাড়ের পথে আঠার মাইল রাস্তা অতিক্রম করলুম অথচ একটি ঝর্ণা ত দূরের কথা এক বিন্দু জলের চিহ্নও কোথাও দেখতে পেলুম না। গভর্ণমেণ্ট থেকে আমাদের জানান হয়েছিল যে, রাস্তার কাছাকাছি প্রচুর জল আছে, কিন্তু আসলে বিপরীত। এই দুর্গম পথে দুর্দ্দান্ত গরমে জলাভাবের জন্যই গভর্ণমেণ্টের কথায় সরল বিশ্বাসী কুলিরা অহরহ মরছে। আমাদেরও বলা হয়েছিল জল নিয়ে যাবার প্রয়োজন নেই, কিন্তু আমরা সে কথায় ভুলিনি।

এখানে জল পাহাড়ের অনেক নীচে ও অপরিষ্কার। এক বাল্‌তি জল আনতে চোখে অন্ধকার দেখতে হয়। সেই অসুবিধা বুঝে পাহাড়ীরা এস্থানে জলের ব্যবসা খুলে বসেছে ও চড়া দামে জল বিক্রী করছে।

স্নান আর হল না। জমিতে গর্ত্ত করে বনের শুকনা ডালপালা জ্বালিয়ে ভাতেভাত চড়িয়েছি দেখি মিঃ মুখার্জ্জী চারটি মুর্গীর ডিম নিয়ে এলো। বললুম, "এত অল্প নিয়ে এলে কার মুখে দেব ?" সে জানাল, "এই এক টাকার আর বড় কষ্টে এনেছি। জিনিষ অল্প আর দাবী বেশী বলে হৈ হৈ পড়ে গেছে।" শুনে ত অবাক।

খানিক পরে আবার সেই ডাক্তারের স্ত্রীর সঙ্গে দেখা হল। আমায় দেখে বললেন, "ওঃ আপনি তাহলে এসেছেন।" তারপর ডিমগুলির দিকে চেয়ে বললেন, "আপনি দেখছি ডিম পেয়েছেন !" বললুম, "হ্যাঁ, আপনি পেয়েছেন ত ?" "আমি ? আমি মুর্গী পেয়েছি।" "তা'হলে আপনার ভাগ্য বেশী সুপ্রসন্ন, রান্না করেছেন ?" "রান্না ! আমার ত খাওয়া হয়ে গেছে। মুর্গী খেয়েই আমি এখন একটু সুস্থ বোধ করছি, নয় ত এতক্ষণ অজ্ঞান হয়ে যাচ্ছিলুম।" তিনি চলে গেলে একা একা খুব খানিক হাসলুম।

তারপর মিঃ মুখার্জ্জী ও মাষ্টার মশাই এলে তাঁদের এ সংবাদ দিতে তাঁরাও হেসে খুন হলেন।

কোনও রকমে খাওয়া সেরে উনুনে আবার জল গরম করতে দিয়ে শোয়ার ব্যবস্থায় লাগা গেল। দিনে যেমন গরম রাত্রে তেমনি ঠাণ্ডা, কাজেই বিছানাপত্র সব বার করতে হল।

করলুম, কিন্তু পাতব কোথায়! পাহাড়ের গড়ান গায়ে যতই ঠিক করে বিছানা করা হয় ততই সে গড়িয়ে নীচে নেমে যেতে চায় দেখে হাসব কি কাঁদব এক সমস্যা। এতদিন তবু ছাউনি পাওয়া গিয়াছিল, আজ তাও নেই। গভীর বনের মাঝে, কঠিন পাহাড়ের গায়ে উন্মুক্ত আকাশের নীচে আজ শোয়ার ব্যবস্থা। যাযাবর জীবনের চরম অবস্থায় পৌঁছেছি।

অগণিত যাত্রী আজ এখানে এসে জমা হয়েছে। এখন তাঁরা সব ক্লান্তির কাছ থেকে ছুটি নিয়ে ঘুমের বুকে হারিয়ে গেছেন, তাই পাহাড় নিস্তব্ধ রূপ ধারণ করেছে। তাঁদের জ্বালান অস্থায়ী উনুনের আগুনে সমস্ত বন আলোয় আলো হয়ে গেছে। আমার ভারী ভয় করতে লাগল, ভাবলুম, যদি এই শুকনা বনে আগুন লেগে

যায়, তবে জলের যা' দুর্ভিক্ষ পুড়ে মরা ছাড়া উপায় থাকবে না।

সে চিন্তা হতে মন ফিরিয়ে প্রকৃতির প্রতি দৃষ্টি দিলুম। দেখি আকাশ থেকে শুভ্র মেঘের মত কুহেলিকা ধরণীর বুকে নেমে এসে তাকে ঢেকে ফেলেছে, আর তার মাঝ দিয়ে তারার মালা-শোভিত আকাশ বড় রহস্যময় লাগছে। সবুজ পাতায় মোড়া গাছগুলিকে স্বর্ণকিরণে স্নান করা'তে অনেক রাত্রে চাঁদ দেখা দিল। এমনি মধুর পবিত্র প্রকৃতির আবেষ্টনীর মধ্যে ঠাণ্ডা মৃদু হাওয়ায় ভেসে-আসা মিষ্টি বুনো গন্ধ আমার ক্লান্ত মনকে মাতাল করে তুলল।

অসমতল ভূমি, অপরিষ্কার শরীর ও তার নিদারুণ যন্ত্রণায় ঘুমের আগমন সম্ভাবনা দেখলুম না, উল্টে নানা এলোমেলো চিন্তা মাথায় বাসা বেঁধে অস্থির করে তুলল। চোখ বুজলেই মৃত মানুষগুলির ক্লান্তি মাখান বিকৃত মুখগুলি কেবলই ভেসে উঠতে লাগল, বিশেষ করে নেপালী যুবকটির। অমন যোয়ান মানুষ পাহাড়ের গায়ে দু'পা এগুতেই মারা গেল কি করে তা' ভারী আশ্চর্য্য। আহা, তার বৌটির এখন কেমন অবস্থা কে জানে। এতক্ষণে সে নিশ্চয়ই তার দুর্ভাগ্যের সংবাদ অবগত

হয়েছে। এই দুর্গম পথে তিনটি শিশু নিয়ে কি করছে কে জানে।

তারপর সেই মাদ্রাজী বীরাঙ্গনাটি। তাঁকে সেই একবারই যা' দেখেছিলুম তারপর আর চোখে পড়েনি। বীরাঙ্গনা বোধ হয় বীরদর্পে আমাদের চেয়েও আগে এগিয়ে গেছেন।

সমতল ভূমির নারকীয় ছাউনিটির অবস্থা এখন কেমন কে জানে। সেখানে এতক্ষণে কত লোক মারা গেছে ও কতলোক নূতন করে মৃত্যু পথে পা বাড়িয়েছে কে জানে।

তারও আগে জাপানী দ্বারা আক্রান্ত বর্মার অংশ আমার ক্লান্ত মনের কোনে উঁকি মারতে বাদ পড়ল না।

১৬ই মার্চ্চ। চোখ খুলে দেখি তখনও মেঘেরা সাদা পাল তুলে প্রাতের আকাশে দেখা দেয়নি, শুধু রাতের কুহেলিকা ভেদ করে দীপ্তিহীন সূর্য্য একখণ্ড রুবির মত ঠিক আমার সামনে বিরাজমান। পাহাড়ের উপরে প্রভাতের সৌম্য, শান্ত পৃথিবীকে মনে হচ্ছে যেন গভীর ধ্যানমগ্ন কোন মহাঋষি যাঁর কপালে রক্তচন্দনের ফোঁটার মত টুকটুকে লাল সূর্য্য শোভা পাচ্ছে। আমি শুয়ে শুয়ে সে মধুর

দৃশ্য মুগ্ধ নয়নে খানিকক্ষণ উপভোগ করলুম। তারপর আমাদের যাত্রা সুরু হল।

ঠিক হয়েছিল খানিক দূরে যেখানে ভাল জল পাওয়া যাবে সেইখানে সকালের জলযোগ ও দুপুরের খাওয়া হবে, কাজেই কিছু না খেয়ে আমরা রওনা দিলুম।

পাহাড়ের গা বেয়ে কিছুটা উঠেছি, হঠাৎ আমার ভীষণ মাথা ঘুরে সব অন্ধকার হয়ে গেল। আমি পাহাড়ের গায়ে ঠেস দিয়ে রাস্তার মাঝেই তৎক্ষণাৎ বসে পড়লুম। বেশ খানিক পরিচর্য্যার পর সুস্থ হলুম। খাদ্যবস্তু বহনকারী কুলিকে ডেকে আমায় প্রচুর মাখন ও বিস্কুট খাওয়ান হল। এখন থেকে খুব ধীরে ধীরে হাঁটার ও দীর্ঘ বিশ্রামের ব্যবস্থা হল।

যতই এগিয়ে চলি ততই প্রকৃতির নব নব দৃশ্যে চোখ ফেরান মুস্কিল হয়, মনে হয় আর একটু দেখি। আকাশে এখন রঙের ছড়াছড়ি,—লাল, সোনালী, পিঁয়াজী, ধূসর ইত্যাদি ইত্যাদি। ভূমির বুকেও সে ব্যবস্থা কিছু কম নয়। সেখানে আবার সবুজের ঢেউ বয়ে গেছে। যতদূর দৃষ্টি যায় সমস্ত পৃথিবী যেন সবুজে সবুজ হয়ে গেছে। কাল সবুজ, হল্‌দে সবুজ, ফিকে সবুজ, গাঢ় সবুজ, বেগুনী সবুজ

ইত্যাদি ইত্যাদিতে সমস্ত পাহাড়, ভূমির গা ঢেকে দূরে দিকচক্রবালে গিয়ে আকাশের ঘন নীল রঙের সাথে মিলে মিশে একেবারে একাকার হয়ে গেছে। সবুজ রঙে মোড়া ঢেউতোলা অগণিত পাহাড়গুলিকে দেখে মনে হয় যেন এখানে একদিন সবুজ রঙের সমুদ্র ছিল যা কোনও মহামুনির শাপে আজ নিশ্চল হয়ে গেছে; ঐ সবুজ রঙের নিশ্চল পাহাড়গুলি সেই সবুজ সমুদ্রের গগনস্পর্শী ঢেউ যেমন অবস্থায় বয়ে চলেছিল তেমনি অবস্থায় স্থির হয়ে গেছে। কখনও বা মনে হয় সবুজ রঙের উত্তরীয়ে সর্ব্বাঙ্গ ঢেকে পুরাকালের মহাঋষিরা মহানিদ্রায় নিদ্রিত আছেন। হয় ত কখন কোন যাদু স্পর্শে উত্তরীয় ফেলে উঠে বসবেন আর আমাদের শোনাবেন জীবনের মহাসঙ্গীত, রচনা করবেন রামায়ণ, মহাভারতের মত মহাগ্রন্থ। আকাশে রঙের উজ্জ্বলতা, ভূমিতে সবুজের স্নিগ্ধতা ও মৃদু হাওয়ার হিল্লোলিত পাতার মর্ম্মর ধ্বনিতে আমার মন অপরিমেয় আনন্দ ও শান্তিতে ভরে গেল।

বেলা সাড়ে দশটার সময়ে এক নাগা বস্তীর কিছু দূরে আমাদের যাত্রা ভঙ্গ হল। বস্তীর মধ্যে যাওয়া হল না, কারণ গভর্ণমেন্ট থেকে বারণ ছিল।

জলের অভাবে আজও স্নান করা হল না। জমিতে গর্ত্ত খুঁড়ে তাইতে বনের শুকনা ডালপালা দিয়ে আগুন করা হল। চা ও ভাত খাওয়া দুইই একসঙ্গে সেরে একঘণ্টার মধ্যে যাত্রার জন্য তৈরী হলুম। এই স্থানে কুলিদের পাওনার অর্দ্ধেক টাকা দিয়ে দেওয়া হল, বাকী ভারতে গিয়ে দেওয়া হবে।

ঘণ্টা খানেক হয়ে গেছে আমরা রওনা হয়েছি ও প্রকৃতির সুন্দর দৃশ্য উপভোগ ও আলোচনা করতে করতে এগিয়ে চলেছি। সহসা দেখি আমাদের একজন কুলি দৌড়ে আমাদের দিকে নীচে নেমে আসছে। কাছাকাছি এসে সে জানাল যে আমাদের ডুলিটি লোকসমেত ভেঙ্গে পড়ে গেছে, আমরা যেন শীঘ্র উপরে যাই। খবর শুনে ত আমার চক্ষু চারিদিক অন্ধকার দেখল। ডুলি ভেঙ্গে পড়েছে শুনলুম, কিন্তু ডুলির উপরের মানুষগুলির যে কি ঘটেছে তা' সেও কিছু বলল না আর আমরাও সাহস করে তাকে কিছু জিজ্ঞাসা করতে পারলুম না। শুধু গগনস্পর্শী পাহাড় ও অতলস্পর্শী গহ্বর এই দুয়ের মাঝদিয়ে সরু রাস্তা ধরে কাঁপতে কাঁপতে এগিয়ে চললুম আমার ললাট লিখন দেখতে।

পৌঁছে দেখি বৃদ্ধ কাওয়াসজী দাঁড়িয়ে আছেন আর ধীরা পাহাড়ের গায়ে ঠেস দিয়ে বসে কাঁদছে। ধীরাকে জীবন্ত দেখে আমি স্বস্তির নিশ্বাস ফেললুম, যাক্ তবে নিদারুণ কিছু ঘটেনি। কাছে গিয়ে তাকে কোলে তুলে নিতেই তার কান্না দ্বিগুণ বেগে আরম্ভ হল। দেখলুম হাঁটু দুটিতে সে বড্ড আঘাত পেয়েছে।

বাহকেরা আবার ডুলি বেঁধে বৃদ্ধ কাওয়াসজী ও ধীরাকে নিয়ে চলে গেল। এই ঘটনার পর থেকে তার কথা ভেবে আমার মনে একটুও শান্তি রইল না। কেবলি ভাবতুম কি জানি কি হবে? আবার যদি পড়ে যায়, যদি গড়িয়ে গভীর গহ্বরে পড়ে যায় তবে কি করব বা যদি পাহাড়ের গায়ে আছড়ে পড়ে মাথা ফেটে যায় তবে কি হবে ইত্যাদি। লীনা কুলির পিঠে চড়ে যাচ্ছে। এখন তার জন্যও মনে নানা ভাবনার উদয় হল।

আমরা ধীরে ধীরে এগিয়ে চলেছি, পাহাড়ের খাড়া রাস্তা দিয়ে অগণিত যাত্রী ছুম্ ছুম্ শব্দ করতে করতে এগিয়ে চলেছেন। যাত্রীদের মধ্যে কয়েকজন আসন্ন-প্রসবা শিখ মহিলাকে দেখলুম। এই দুর্গম পথ ঐ অবস্থায় কি করে এবং কোন সাহসে হেঁটে চলেছেন ভগবান জানেন।

এখন বেলা দুপুর। বিশ্রামের উদ্দেশ্যে দীপ্ত সূর্য্যকে আড়াল করে বাঁশ ঝাড়ের পাশে বসলুম। আমাদের পিছনে বাঁশবনে ঘেরা বিরাট পাহাড় আর সম্মুখে দিগন্ত বিস্তৃত সবুজ রঙের মেলা, ঠিক যেন পৃথিবী জোড়া একখানি সবুজ রঙ্গের গাল্‌চে। সূর্য্য এখন মধ্যাকাশে, তার উজ্জ্বল আলো ঝর্ণা ধারার মত সবুজ পাহাড়ের মাথায়, মাথায় অবিরাম ঝরে পড়ছে। আকাশের রং নীল এবং তা' এত গাঢ় যে দেখে মনে হয় যেন তাতে কালি লেপে দেওয়া হয়েছে। সেই নীল আকাশের বুকে ইতস্ততঃ বিক্ষিপ্ত ভাবে ছড়িয়ে আছে শঙ্খ শুভ্র মেঘ যেন এক একটি সাদা ফুলের তোড়া। আমাদের মধ্যে প্রাকৃতিক সৌন্দর্য্যকে কেন্দ্র করে আলোচনা সুরু হল। সব হারিয়ে আজ যে রাস্তায় দাঁড়ায়েছি সে আমাদের দুর্ভাগ্যের জন্য সন্দেহ নেই, কিন্তু সৌভাগ্যও আমাদের অত্যন্ত বেশী, তাই না আজ এমন স্থানে প্রকৃতি যে কত সুন্দর ও তা' যে কত শান্তিদায়ক তা' উপভোগ করতে পারছি, যেখানে সাধ করে বা সাহস করে কেউ কোনদিন আসতে চাইত না। আমাদের জীবনে এ এক মস্ত বড় অভিজ্ঞতা ও মস্ত বড় লাভ সন্দেহ নেই তা' আমরা শারীরিক

যত কষ্টই পাইনা কেন। মিঃ মুখার্জ্জীকে দুঃখসহ জানালুম, "ক্যামেরাটি তুমি ত সঙ্গে আনলে না, নয় ত এ মধুর দৃশ্যের কিছু সংগ্রহ করে নিয়ে যাওয়া যেত।" উত্তরে সে জানাল, "তুমি কিছু ভেবনা। এ দেশ যদি জাপানীরা দীর্ঘ দিন হাতে রাখতে পারে, তবে দেখবে কয়েক বছর পরে এখানে মোটর ও ট্রেণ চলছে। যাচ্ছি ত কষ্ট করে হেঁটে, কিন্তু যখন আবার ফিরে আসব তখন হয় ত এই পথ দিয়ে মোটর কিংবা ট্রেণে করে ছবি তুলতে তুলতে ফিরব।

আবার চলা সুরু হল। চলতে ভারী কষ্ট হতে লাগল কেবলি পায়ে পা জড়িয়ে যায় আর মনে হয় এইখানেই শুয়ে পড়ি উঠে আর কাজ নেই। কিন্তু উপায় নেই, চারিদিক থেকে প্রকৃতির নব নব দৃশ্য সকল অহরহ হাতছানি দিচ্ছে ও তাদের সে আহ্বানে আমার সৌন্দর্য্য-কাঙ্গাল মন মাতাল হয়ে উঠছে।

এখন সূর্য্যের তেজ কমে এসেছে ও তার ম্লান আলোর ছায়া পৃথিবীর উপর এসে পড়েছে।

হঠাৎ পাহাড়ের উপর থেকে কোলাহলের শব্দ পেয়ে আমরা দ্রুত সেই দিকে এগিয়ে গেলুম। কাছে এসে দেখি হৈ হৈ কাণ্ড! মণিপুরী কুলিগুলি অন্ন সংস্থানের আশায়

সর্ব্বদা এই পাহাড়ের পথে ওঠা নাবা করে এত রোগা পাতলা হয়ে গেছে যে মনে হয় যেন ঠিক ছিপ্ছিপে সুপুরী গাছ। এমনিই এক মণিপুরী কুলির সঙ্গে পাথর কুঁদে কাটা দৈত্যের মত বিরাট চেহারা, বন্য জন্তুর হিংস্রতা মাখান মুখ ও বহু অস্ত্রে সজ্জিত এক নাগা যুবকের ঝগড়া হচ্ছে। কুলির সাহস দেখে ত আমি অবাক! যেই সে একটু কিছু কথা বলে অমনি সেই নাগা দৈত্য বল্লম তুলে হুঙ্কার দিতে দিতে তার দিকে এগিয়ে আসে। সে দৃশ্য দেখে আমি ত ভয়ে অস্থির। কেবলি অন্যান্য কুলিদের বলতে লাগলুম যে ওকে তারা যেন থামায়, কিন্তু কে কার কথা শোনে।

আমি কিন্তু তাদের ঝগড়ার প্রতি বেশীক্ষণ মনোনিবেশ করতে পারলুম না, কারণ তার চেয়েও আকর্ষণের বস্তু সেখানে পাওয়া গেল। নাগা লোকটি সরে আসতেই দেখি কি তার পিছনে যৎসামান্য আবরণে কোন প্রকারে লজ্জা নিবারণ করে ফুলের সাজে সজ্জিতা হয়ে দাঁড়িয়ে আছে একটি নাগা যুবতী। মুখ তার পাহাড়ী মেয়েদের যেমন হয়ে থাকে তেমনি, কিন্তু অপূর্ব্ব তার দেহের গঠন ও স্বাস্থ্য দেখে আমার চোখ জুড়িয়ে গেল। তাকে দেখা আমার যেন আর শেষ হয় না। মনে হয় ও যেন কোন মহা শিল্পীর

বহু যত্নে গড়া একখানি নিখুঁত প্রতিমা, অথবা রূপে, রসে, গন্ধে, বর্ণে ভরা এই প্রকৃতি হটাৎ মানবী মূর্ত্তি নিয়ে আমার সামনে এসে দাঁড়িয়েছে। তারও হাতে লম্বা বল্লম ও কোমরে যেন কি সব অস্ত্র ঝুলছে। একটি জিনিষ আমায় ভারী আশ্চর্য্য করল যে, এত কাণ্ড আর এত যে হৈ হৈ তার সামনে হচ্ছে সে কিন্তু নির্ব্বিকার, যেন মনে হয় সে এ জগতে নেই, অথবা সে যেন একজন সুদক্ষ অভিনেত্রী সময়ের অপেক্ষায় রয়েছে, সময় হলেই সে তার অভিনয়-নৈপুণ্য দেখাবে। পুরুষের মুখের মত তার মুখে হিংস্রতা নেই বরং তা' বড় শান্ত ও মাধুর্য্যপূর্ণ।

এক সময়ে মণিপুরী বীর রণে ক্ষ্যান্ত দিল, কিন্তু কি করে যে রণ ক্ষ্যান্ত হল তা' আমি টের পেলুম না।

এখন আমরা এক নাগাবস্তীর পাশ দিয়ে চলেছি। রাস্তার ধারে নাগাদের এক বাড়ী দেখলুম। চারধারে বাঁশের বেড়া ও ঠিক তার মাঝখানে বাড়ী। বাড়ীর এক ভাগে অনেকগুলি ঘর ও একভাগে লম্বা ও বেশ চওড়া দালান। বাইরে থেকে উঁকি মেরে দেখলুম ঘরে দেওয়ালের গায়ে অজস্র রকম ঝক্‌ঝকে অস্ত্র টাঙান রয়েছে। দালানের দেওয়ালের গায়ে উঁচু বেদী করা আছে। শুনলুম এই

দালানে নাকি নাচ হয়। এখানে দেওয়ালে নানাপ্রকার বাদ্যযন্ত্র সাজান আছে। সমস্ত বাড়ীটি পরিষ্কার পরিচ্ছন্ন, সহরবাসীদের হার মানায়।

চলতে চলতে আমার কেবলই সেই নাগা স্ত্রীলোকটির কথা ও তার স্বাস্থ্য, গঠন ও জীবনযাত্রার কথা মনে পড়তে লাগল। যেমন নয়নভুলান চেহারা তেমনি স্বাধীন জীবন-যাত্রা। আহা, আমি যদি অমন নাগা হতুম তবে কি মজাই না হত। প্রকৃতির ক্রোড়ে, প্রকৃতির সঙ্গে ওদেরই মত মিলে মিশে এক হয়ে থাকতুম। ওদেরই মত আমার স্বাস্থ্য ও গঠন হত। ওদের রং কালো, কিন্তু কালো রঙে আমার একটুও আপত্তি নেই, যদি পাই অমন স্বাস্থ্যোজ্জ্বল ভুবন-ভুলান চেহারা। এখানকার যত পাহাড়, বন, ঝর্ণা ইত্যাদি তবে আমার নখদর্পণে থাকত। প্রতিদিন প্রাতে সূর্য্যের স্বর্ণকিরণে স্নান করে পুরুষদের মত বল্লম কাঁধে আমি শিকার করতে বেরুতুম, কেউ আমায় বাধা দিত না বা নিন্দা করত না। সমস্ত দিন সবুজ বনে ঢাকা পাহাড়ে ঘুরে, ঝর্ণার জল আকণ্ঠ পান করে, গায়ে ধুলো মেখে সন্ধ্যার ম্লান আঁধারে আলোছায়ার খেলা দেখতে দেখতে আমার শিকার কাঁধে বাড়ী ফিরতুম; রাত্রে মুক্ত প্রকৃতির কোলে

বসে অদ্ভুত বাদ্যযন্ত্রসহ সকলের সাথে গলা মিলিয়ে না জানি কি মুক্তির গান গাইতুম। না থাকত কোনও ভয়, না থাকত অন্যায় শাসনের সহস্র বন্ধন আর না থাকত পরাধীনতার মর্ম্মবিদারক সুতীব্র জ্বালা।

দিকে দিকে এখন বিদায়ের সাড়া পড়ে গেছে। আমি সূর্য্যাস্ত দেখবার জন্য পাহাড়ের গায়ে হেলান দিয়ে রাস্তায় বসে পড়লুম। ঝকঝকে সূর্য্য যেই পাহাড়ের কোলে হারিয়ে গেল অমনি বিশ্বশিল্পী নানা রঙের তুলি বুলিয়ে আকাশের বুকে অপূর্ব্ব চিত্র অঙ্কন করতে বসলেন। সে সব রঙের আভা সবুজ পৃথিবীর বুকে পড়ে তাকে করে তুলল রমণীয। সমস্ত আকাশে এখন সোনার ছড়াছড়ি। দিকচক্রবালে ঝরে পড়া লাল আলো লাল রুবির মত শোভা পাচ্ছে। ম্লান পৃথিবীর বুকে রাশি রাশি পান্নার ঢেউ বয়ে যাচ্ছে—বুঝি কুবেরের ভাণ্ডার আজ বিশ্বের কাছে উন্মুক্ত। এ অপূর্ব্ব, অবর্ণনীয় সৌন্দর্য্যের সামনে দাঁড়িয়ে কে আর অনুভব করে ফেলে আসার বিরহ ব্যথা, কার আর মনে পড়ে সংসারের জ্বালা, রোগ যন্ত্রণাও ঘুমিয়ে পড়ে। আমার আনন্দাশ্রুসিক্ত চোখের সামনে আকাশে মুক্তা ছড়িয়ে সন্ধ্যা এসে দাঁড়াল।

সাতটার সময়ে আমরা সতের মাইল পথ অতিক্রম করে "সীটা" নামক স্থানে পৌঁছুই। অন্যান্য যাত্রীরা আরো এগিয়ে জলের ধারে বিশ্রাম নেন। আমরা এখানে গভর্ণমেন্ট কর্ত্তৃক নির্ম্মিত ছোট্ট ছাউনিতে আশ্রয় পাই। ছাউনির পাশেই গভর্ণমেণ্টের ডাক্তারখানা। ডাক্তার একজন বাঙ্গালী ভদ্রলোক।

বিশ্রাম নিয়ে কোনও প্রকারে খিচুড়ী গলাধকরণ করে একেবারে বিছানা নিলুম। এ দু'দিন পাহাড়ে পাথরের আঘাত লেগে ও পাথর কুচি ফুটে আমার দুটি পা ক্ষত বিক্ষত হয়ে গিয়েছিল। এখন শরীরের যন্ত্রণার সঙ্গে সঙ্গে ক্ষতের যন্ত্রণা আমায় অস্থির করে তুলল।

আমি একেবারে ধারে প্রায় মুক্ত আকাশের নীচে শুয়েছি। ঘুমের কোনও তাগাদা নেই দেখে ও যন্ত্রণার হাত হতে নিষ্কৃতি পাবার জন্য প্রকৃতির রূপের আশ্রয় নিলুম।

শুনেছি আগামী কাল নাকি আমরা সমতলের কাছা-কাছি পেঁাছে যাব, কাজেই প্রকৃতির এমন মধুর আবেষ্টনীর মেয়াদ বোধ হয় আজকের রাত ও আগামী কাল কতক্ষণের জন্য কে জানে। মিলনের ক্ষন এত অল্প ও বিদায় এত

ক্রুত ভেবে মন খারাপ হয়ে গেল। বিদায় মানে ত চির বিদায়। আর কি কোনও দিন প্রকৃতির এমন স্নেহঝরা মধুর সংস্পর্শে আসব। এমন স্বর্ণখচিত আকাশের তলে শুভ্র কুহেলিকা মাখান রহস্যময় পাহাড়, আঁধারের ওড়না ঢাকা গাছপালা ও বাতাসের মৃদুস্পর্শে শুষ্ক পাতার মর্ম্মর সঙ্গীত শুয়ে শুয়ে উপভোগ করতে পারব। কি জানি আর কোনদিন প্রকৃতির সঙ্গে এমন নিবিড় পরিচয় ঘটবে কি না।

যখন সুখের সংসার হারিয়ে রাস্তায় বেরুলুম মনে হল আমি একেবারে নিঃস্ব হয়ে গেছি। তখন কি জানতুম আমার ভাগ্য বিধাতা আমার অজ্ঞাতে যা' হারালুম তার চেয়েও বহুগুণে মূল্যবান ধন রত্ন নিয়ে বসে আছেন আমার হৃদয় পাত্র উছলিয়ে দিতে—যা' কোনদিন হারাবে না, ক্ষয় হবে না। আজ আমার ও বহু দুঃখী সহযাত্রী ও যাত্রিণীর মধ্যে কোনও প্রভেদ নেই, তাদের সঙ্গে একই স্তরে আমি এসে দাঁড়ায়েছি, কিন্তু তবুও কোনও দিন ভগবানের কাছে এ অভিযোগ করতে পারব না যে আমি রিক্ত হয়ে গেছি, আমার আর কোনও অবলম্বন নেই। বরং বলব, তুমি আমার জীবন কূলে কূলে ভরে দিয়েছ, করুণার তোমার সীমা নেই প্রভু।

গভীর রাত্রিতে একফালি চাঁদ দেখা দিল। তার মৃদু আলো পাহাড়ের মাথায় মাথায় নূতন রূপের সৃষ্টি করল। দিকদিগন্তে ছড়িয়ে পড়া রাশি রাশি কালো মেঘের মাঝে মিষ্টি হাসির মত একফালি চাঁদ আর তারই মৃদু সোনালী আভা মেখে দাঁড়িয়ে আছে ঐ যে পাহাড়গুলি ওদের দিকে চেয়ে আমার যেন বিস্ময়ের সীমা থাকে না। আহা, ওরা যদি কথা বলতে পারত তবে আজ ওদের পদপ্রান্তে বসে কত যুগযুগান্তরের বিস্ময়ভরা কত কাহিনী ওদের কাছে শুনতুম যা' আর কোথাও থেকে শুনতে পাওয়া যাবে না।

নিদ্রাহীন চোখে শুয়ে শুয়ে এই সব আবল তাবল কত কি ভেবে চলেছি। ক্লান্তিতে ভেঙ্গে পড়া সত্বেও প্রকৃতির মোহিনী মূর্ত্তির দিক থেকে আমার তৃপ্তি ভরা অপলক দৃষ্টি ফেরাতে পাচ্ছি না। মিঃ মুখাজ্জীর কথা মনে পড়ল। এই সব পাহাড়ের মাঝ দিয়ে দিয়ে হয় ত একদিন মোটর ও ট্রেণ চলবে। জাপানীরা যেরূপ অধ্যবসায়ী ও তৎপর হয় ত সত্যিই একদিন তা' বাস্তবে পরিণত হবে। হয় ত আরো কত কি সভ্য জগতের বস্তু এখানে আমদানী হবে এবং সেদিন এ প্রকৃতি আর একরূপ ধারণ করবে। সেও এক রকম দৃষ্টি আকর্ষণকারী রূপ হবে, কিন্তু সে রূপের

মাঝে আজকের তাপসীর স্নিগ্ধতা থাকবে না, থাকবে ঐশ্বর্য্যের তীক্ষ্ণ হাসির ছটা। সেরূপ উল্লাসের খোরাক যোগাবে কিন্তু জীবনের সবচেয়ে বড় কাম্য শান্তি এনে দিতে সক্ষম হবে না।

আজ ১৭ই মার্চ্চ। ভোরের বর্ণহীন আকাশে শুধু শুকতারা জ্বল জ্বল করছে। প্রভাতের আগমনের সঙ্গে সঙ্গে প্রকৃতির বিভিন্ন অংশ আঁধারের জাল ভেদ করে হাত-ছানি দিয়ে তাদের রূপ দেখার নিমন্ত্রণ জানাল। এ কদিন ধরে সর্ব্বক্ষণই ত প্রকৃতির রূপ দেখছি, কিন্তু আশ্চর্য্য তা' এতটুকু পুরাণ বলে মনে হয় না বা দেখতে ক্লান্তি আসে না। আমার কাঙাল মন ত অবিরাম তাদের উপর দৃষ্টি বুলিয়ে চলেছে। প্রকৃতির সম্বন্ধে তার মরুভূমির তৃষা।

মুখহাত ধুয়ে সবাইকে ডেকে তুললুম। জলযোগ সেরে ছ'টার সময়ে আবার রওনা দিলুম। কিছু দূর এসে এই প্রথম গভর্ণমেণ্ট কর্ত্তৃক যাত্রীদের জন্য নির্ম্মিত জলের সুন্দর ব্যবস্থা দেখলুম।

পাহাড়ের পথে এতখানি আসার পর আজ মাইল খানেক চলে পাহাড়ে গায়ে বেগুণী রঙের ফুল প্রথম দেখতে পেলুম।

খানিক এগিয়ে গিয়ে আজ উৎরাই পেলুম ; কিন্তু তারপরেই সুরু হল ভীষণ চড়াই। রাস্তা অত্যন্ত ভয়াবহ, তার একধারে সুউচ্চ পাহাড় ও একধারে অতলস্পর্শী গহ্বর ; পড়লে যে কোথায় যাব তার ঠিক নেই।

রাস্তায় আজ ত দুটি নাগাবস্তী পেলুম। পাহাড়ে পাহাড়ে এখানে অনেক নাগাবস্তী আছে, তবে আমরা এই চারটি নাগাবস্তী পেয়েছি।

আজ সকাল থেকে সূর্য্যের তেজ অন্য দিনের চেয়ে বেশী আর গরমও খুব। জল বহনকারী কুলি আমাদের কাছ থেকে অনেক দূরে এগিয়ে গেছে। মাত্র এক ফ্লাস্ক্ জলই আমাদের সমস্ত দিনের সম্বল। একান্ত জলের প্রয়োজন হলে শুধু গলা ভেজাতে আধকাপ করে এক একজনকে জল দেওয়া হয়।

আমরা যত এগিয়ে চলেছি বন তত স্বচ্ছ হতে স্বচ্ছতর হয়ে আস্‌ছে। শেষে পাহাড়ের উপরে আর গাছপালা পেলুম না কেবল শুক্‌ন পাতলা ঘাস। কোথাও আবার তাও নেই শুধু কঠিন পাথর শোভা পাচ্ছে।

এখন প্রায় এগারোটা। মাথার উপর প্রচণ্ড সূর্য্য ও পায়ের তলায় উত্তপ্ত পাথর আমাদের ঝলসে দিচ্ছে। যে

পাহাড়ের উপর দিয়ে চলেছি তার রাস্তা অত্যন্ত সঙ্কীর্ণ, একজন লোক কোন প্রকারে যেতে পারে। রাস্তার দু'পাশ আবার গড়িয়ে ভূমির দিকে কোথায় কোন গহ্বরে নেবে গেছে কে জানে। এই রাস্তায় চলতে চলতে আমার শরীর আবার ভীষণ খারাপ হল। সমস্ত শরীরে ঝাঁকুনি দিয়ে দুই চোখে নেবে এলো নিবিড় অন্ধকার। এবার আমার আর বসার সামর্থ্যও রইল না। ঘাসহীন তপ্ত পাথরের উপরে লুটিয়ে পড়লুম। মিঃ মুখাজ্জী এসে প্রথমে ব্যাপারের গুরুত্ব বুঝতে পারে নি। পরে যখন দেখল আমার কথা বলবারও সামর্থ নেই তখন বড় ব্যস্ত হয়ে পড়ল। প্রথমেই আমাকে বলল, "শুধু শুধু প্রাণ হারাবার জন্য কেন বর্মা ছাড়লে বলত? এখন কি করা যায়।" করবার এখন আর কিছুই নেই এমন কি সঙ্গে প্রচুর জল পর্য্যন্ত নেই। খানিক পরে উঠতে চেষ্টা করলে বারণ করল, কিন্তু শুয়ে থাকার উপায় নেই, পিঠ আমার প্রায় ভাজা ভাজা হতে চলেছে।

বেশ খানিক বিশ্রাম নিয়ে আবার রওনা হলুম। এবার ভারী ভয় হতে লাগল, ভাবলুম কতক্ষণে পথ শেষ হবে ও বিশ্রাম পাব। মিঃ মুখাজ্জী ডলির অনেক চেষ্টা

করল কিন্তু পাওয়া গেল না। না পাওয়া গেছে ভালই হয়েছে। সত্যি বল্‌তে কি ঐ অমজবুত ডুলিতে চড়তে আমার একটুও ভাল লাগে না। রাস্তায় চলতে চলতে পাল্কীর ন্যায় আর এক প্রকার ডুলি চোখে পড়ল। এই প্রকার ডুলিগুলি যেন একটু মজবুৎ বলে মনে হল।

কিছুদূর এগিয়ে পাহাড়ের পথে দু'দিন হাঁটার পর এই প্রথম একটি ঝর্ণা দেখতে পেলুম। অত্যন্ত ক্ষীণ তার ধারা। অনেক উঁচু থেকে নীচে পড়ায় তাকে ভারী সুন্দর লাগছে, দেখে মনে হয় যেন রাশি রাশি মুক্তা ঝরে পড়ছে। আমার মন খুসীতে ভরে গেল।

আমার অসুস্থ হবার ঘণ্টাখানেক পরে দিক্‌দিগন্ত আঁধারে আচ্ছন্ন করে দেখা দিল জলভরা মেঘ। পাহাড়ের উপরে দাঁড়িয়ে আকাশের এ রূপ দেখতে বড় সুন্দর। তার পরেই মেঘের ফাঁকে ফাঁকে তীক্ষ্ণ হাসি ছড়িয়ে ও গুরু গম্ভীর বাদ্যের শব্দে ধরণীর হৃদয় কম্পিত করে ঝমাঝম্ করে এলো বৃষ্টি। আকাশ, পাহাড়, গাছপালা সব বর্ষণের আড়ালে হারিয়ে গেল।

বৃষ্টি খানিক পরে থেমে গেল বটে, কিন্তু তার পরশ

পেয়ে সবুজ পৃথিবী সজীব ও সতেজ হয়ে উঠ্‌ল। এখন রবির কিরণস্নাত হয়ে সে যেন মিষ্টি হাসছে।

বৃষ্টি হওয়ার একটু পরেই রাস্তায় চলতে চলতে এক ভীষণ কাণ্ড ঘটল। এখন আমরা যে রাস্তা দিয়ে চলেছি তার এক ধার আকাশে উঠে গেছে। রাস্তা আবার এত সরু যে একজন লোকেরই চলা মুস্কিল। এর উপর বৃষ্টি হয়ে রাস্তা ভীষণ পিচ্ছিল হয়ে উঠেছে। এ হেন রাস্তায় এসে মিঃ মুখার্জ্জী আছাড় খেল। আমি শুধু দেখলুম তার অর্দ্ধেক শরীর রাস্তায় ও আর্দ্ধক শরীর অতলস্পর্শী গহ্বরে ঝুলছে, তারপরই আমার চোখে সমস্ত পৃথিবী লুপ্ত হয়ে গেল। দৃষ্টি ফিরে পেয়ে তাকে আমার সামনে দাঁড়িয়ে থাকতে দেখে আশ্চর্য্য হয়ে গেলুম। কি করে নিশ্চিত মৃত্যুর মুখ থেকে সে ফিরে এলো। সে আমার বিস্ফারিত দুই চোখের দিকে চেয়ে মৃদু মৃদু হাসছে তখন।

বৃষ্টির সঙ্গে সঙ্গে চড়াই শেষ হয়ে আমাদের উৎরাইয়ে নামা সুরু হল। যখন পাহাড়ের চড়াইয়ে উঠতুম মনে হত এ বড় কষ্টকর কখন উৎরাই আসবে। কিন্তু উৎরাইয়ের পথ আরো কষ্টকর। চড়াইয়ের মত উৎরাইয়ের পথও অত্যন্ত খাড়া আর সেই পিচ্ছিল পথে নীচে নামা বড়ই

বিপদজ্জনক। উৎরাইয়ের পথে নামতে আমরা বাপরে মারে করে অস্থির।

ভীষণ উৎরাইয়ের পথে ষোল মাইল শেষ করে বেলা দুটোর সময়ে "নানটাক" নামক ছোট্ট বস্তীতে গবর্ণমেণ্ট নির্ম্মিত ছাউনিতে পেঁাছুই। ছাউনিতে এসে আমার প্রথম কাজ হল ধূলাবালি ভরা তার ভূমির উপর শুয়ে পড়া। এখন আমার দাঁড়াবার বা বসবার শক্তি নেই।

একটু পরে উঠে ঘুরতে বেরুলুম। আমরা যেখানে আছি তার থেকে বস্তী বেশ দূরে। এখানে আসামীদের ছোট ছোট আলু ও পিঁয়াজ বিক্রী করতে দেখলুম। আমি ত মহাখুসী হয়ে তৎক্ষনাৎ আলু, পিঁয়াজ কিনে নিলুম। আমি সব চেয়ে খুসী হলুম বহু দূরবর্ত্তী ঝর্ণার জলের ধারাকে উঁচু নীচু পাথরের মাঝ দিয়ে বয়ে যেতে দেখে। যাক্, দুদিন পরে তবে আজ ভাল ভাবে স্নান করা যাবে।

তাড়াতাড়ি ছাউনিতে এসে রান্নায় ব্যবস্থায় লেগে গেলুম। আমি করলুম আলু পিঁয়াজের দম, নাইডু করল ভাত আর বাঙ্গালের উপর মুগুর ডালের ভার দেওয়া হল। তারপর স্নানের পালা।

'মিনতা' থেকে যাত্রা করার পর আমার চুলে হাত

পড়েনি। আজ আরাম করে বিছানায় বসে বহু যত্নে বেণী বিন্যাসে মন দিলুম। হঠাৎ দেখি আমাদের ছাউনিতে প্রায় পনেরো ষোল জন কুলি এই মোটা বাঁশের লাঠি নিয়ে ভীষণ ঝগড়া সুরু করেছে। তাদের ঝগড়ার গতি দেখে বুঝলুম যে মারামারির আর বেশী দেরী নেই। নাইডুকে ডেকে ব্যাপার কি জিজ্ঞাসা করতে সে যা' বলল শুনে ত আমার বাক্‌রোধ হবার উপক্রম। যেখানে ঝগড়া হচ্ছে সেখানে নাকি একটি কুলি এই মাত্র মারা গেছে। পাহা-ড়ের পথে হাঁটতে সুরু করে এই নিয়ে আমরা বারোজন লোকের মৃত্যু দেখলুম। এ ছাড়া বহু অর্দ্ধমৃত ও প্রায় মৃত লোক দেখেছি। কিন্তু যাক্ সে কথা, ওরা ঝগড়া করছে ঐ মৃত লোকটিকে সরিয়ে ফেলার পর কে ঐ মৃত লোকটির স্থান দখল করবে এই নিয়ে। সর্ব্বনাশ! মানুষ বিপদে পড়ে কোন স্তরে নেমে এলো! জলজ্যান্ত মানুষ এইমাত্র অসহায় ভাবে পশুর মত মারা গেল তার জন্য না আছে দুঃখ, না আছে সমবেদনা, উল্টে এই লাঠালাঠি! মিনতা থেকেই শ্রেণীর বালাই উঠে গেছে, কাজেই এখানে পাশাপাশি দুটি ছাউনি একেবারে কুলিতে কুলিতে ঠাসা। এখন ঝগড়ার গন্ধ পেয়ে সবাই রে রে করে সাড়া দিল।

আশ্চর্য্যের কথা যে এমন বিপরীত অবস্থার মধ্যে অনেকে কিন্তু নির্ব্বিকার! কেউ পুরী ভাজছে, কেউ গল্প করছে, আবার কেউ পড়ে পড়ে ঘুমচ্ছে। আমার ত ভীষণ ভয় করতে লাগল। খানিক পরে জানিনা কেমন করে ঝগড়া আপনিই থেমে গেল।

আজ আর সূর্য্যাস্ত দেখতে পেলুম না, কারণ আমরা এখন চারিধার দিয়ে উঁচু উঁচু পাহাড় বেষ্টিত হয়ে আছি। শুয়ে শুয়ে দেখলুম এক সময়ে দিনের আলোকে ঢেকে গাঢ় আঁধার পাহাড়ের গা বেয়ে নেবে এসে গাছপালা, ভূমি সব ঢেকে দিল।

আজ এক অভাবনীয় কাণ্ড হল। জানিনা কি কারণে সন্ধ্যেবেলা আমি একেবারে গভীর ঘুমের মাঝে হারিয়ে গেলুম। ঘুম যখন ভাঙ্গল দেখি চারিদিক নিস্তব্ধ নিঝুম ও ভীষণ অন্ধকার; শুধু ঝর্ণাধারার রিমঝিম শব্দ অবিরাম ভেসে আসছে। কি জানি কত রাত। আমি ঘুমিয়েছি দেখে ওরা হয় ত আমায় ডাকেনি; হয় ত ওদের খাওয়াও হয় নি। ভারী লজ্জা বোধ করলুম। ডেকে দেখলুম, কিন্তু কেউই সাড়া দিল না। ঘুমে তারা একেবারে অচৈতন্য।

আমার আর ঘুম এলো না। কিন্তু জেগে থেকেও

শান্তি পাচ্ছি না, কারণ শুয়ে শুয়ে উপভোগ করবার মত আজ সামনে কোনও মনোরম উপচার নেই, শুধু আঁধার আর আঁধার। মনে পড়ে গেল আর মাত্র পাঁচ মাইল আমাদের হাঁটা পথের বাকী—তারপরেই সমতল। যাক্ শেষ পর্য্যন্ত বেঁচে ফিরে যাচ্ছি। আমার মত শরীর নিয়ে বেঁচে ফিরে না যাওয়াটাই স্বাভাবিক ছিল, কিন্তু তবু যে এই দুর্গম পথ অতিক্রম করে বেঁচে ফিরে যাচ্ছি এ শুধু আমার অপরিসীম আগ্রহ ও মনোবলের জন্য। প্রকৃতির নব নব রূপ দেখবার আগ্রহ নিয়ে আমি পাহাড়ের পথে পা দিই এবং সে আগ্রহকে পূর্ণ করবার জন্য মনোবল আমার এগিয়ে নিয়ে এসেছে। আমার যখনি কষ্ট হয়েছে আমি প্রকৃতির রূপের আশ্রয় নিয়েছি এবং সেইখান থেকেই আমি আনন্দ, শান্তি ও নষ্ট শক্তি ফিরে পেয়েছি। ভগবান যদি আমায় এ সম্পদ থেকে বঞ্চিত করতেন, তবে এই দুর্গম পথ ত আমি অতিক্রম করতে পারতুমই না, উপরন্তু বহু মৃত ব্যক্তির সঙ্গে এই পাহাড়ের পথই আমার চিরকালের সমাধি হ'ত।

আজ ১৮ই মার্চ্চ। তাড়াতাড়ি জলযোগ সেরে ভোরবেলা রওনা হলুম। বাকী পাঁচ মাইল উৎরাই অতিক্রম করে আমরা

কটি কঙ্কালপ্রায় জীব বেলা দশটার সময়ে সমতলে এসে পৌঁছলুম।

সামনে যতদূর দৃষ্টি যায় শুধু সবুজ আর সবুজ। তারই মাঝে মাঝে ছবির মত ছোট ছোট মাটির ঘর, কত অগণিত লোক, কি কোলাহল, অথচ না আছে ভয় না আছে বেদনা বা ক্লান্তি—যা' এতদিন আমার প্রাণ অস্থির করে তুলেছিল। এদেরই মাঝে এদেরই মত করে আবার জীবন কাটাতে পারব ভেবে ভারী আনন্দ হল।

যখন পাহাড়ের পথে এসেছিলুম মৃত্যুর ধ্বংস লীলা দেখে ভাবিনি যে আমারা লোকালয়ে ফিরে যেতে পারব। আজ বেঁচে ফিরে আসতে পেয়ে ভারী মজা লাগছে। এত শুধু বেঁচে ফিরে আসা নয়, এযে নব জন্ম নিয়ে ফিরে আসা।

এখন আমরা 'হাইডাকের' মধ্যে দিয়ে চলেছি। রাস্তায় দেখি স্ত্রীলোকেরা কত খাদ্যসম্ভার নিয়ে বসে আছে। আমাদের অবস্থা এখন দুর্ভিক্ষের দেশের লোকের মত। এতদিন পরে এত রকম খাবারের উপচার দেখে মাথা ঘুরে গেলে। সবাই আমরা বাজার করতে সুরু করলুম। চাল, আলু, বেগুন, মটর শুটী, বাঁধাকপী যা চোখে

পড়ে তাই কেনা হয়। এক জায়গায় মাগুর মাছ দেখে মিঃ মুখার্জ্জী মাষ্টারমশাইকে জিজ্ঞাসা করল, "কতটা মাগুর মাছ নেওয়া যায় বলুন ত মাষ্টারমশাই ?" উত্তরে মাষ্টার মশাই জানালেন যে একসের। তাঁকে "কিছু জানেন না।" বলে থামিয়ে দিয়ে আমায় জিজ্ঞাসা করল. 'কত নেব ?' বললুম 'দেড় সের।' "উঁহু, ওতে আমার কম পড়বে।" বলে মাছউলীকে দু' সের মাছ দিতে হুকুম করল। খানিক দূরে দেখি চিঁড়ে, মুড়কি, গুড় ইত্যাদি থরে থরে সাজান। আমি মিঃ মুখার্জ্জীকে ডাকলুম, "এই শুনছ।" উত্তর দিল, "খু—ব, কি কিনতে হবে ?" তারপর আমরা দুজনে যা' চিঁড়ে, মুড়কি, গুড় ইত্যাদি কিনলুম তাতে একটি বিরাট পুঁটুলি হল। রাস্তায় যেতে যেতে দেখি কয়েকজন ভারী করে দুধ ও দৈ নিয়ে চলেছে। তাদের থামিয়ে দুধ ও দৈ দুই-ই কেনা হল। এইবার আমরা হাইডাকে যেখানে যাত্রীদের জন্য যানের বন্দোবস্ত আছে সেখানে এসে পেঁাছলুম।

এখানে এসে দেখি বিরাট ব্যাপার ! অগণিত লোক ও তাদের কর্ণবিদারী চীৎকারে স্থানটিকে মনে হয় যেন একটি বাক্‌মুখরিত সমুদ্র। যানের মধ্যে আছে শুধু

গরুর গাড়ী ও পাল্কীর মত ডুলি। গরুর গাড়ীতে আমার আর একটুও ওঠার ইচ্ছা ছিল না, আবার হাঁটারও শক্তি না থাকায় এবার ডুলিতে উঠতেই হল।

বেলা বারটার সময়ে "ওয়ানজিন" নামক স্থানে পৌঁছলুম। এখানে 'ইভাকুইজ'দের জন্য বাস পাওয়া যায়। আমাদের এক্ষুনি যাবার ইচ্ছা নেই। সঙ্গের লোভনীয় বাজারের সদ্‌ব্যবহার করবার জন্য আমরা থাকার স্থানের খোঁজ আরম্ভ করলুম। শীঘ্রই একজন দয়ালু বাঙ্গালী ব্যবসায়ীর সঙ্গে দেখা হয়ে গেল। তিনি সাদরে আমাদের তাঁর বাড়ীতে নিয়ে গেলেন ও রান্নাখাওয়া সমাধা করতে অনুরোধ জানালেন। তাঁর আসামী স্ত্রী বাংলা জানেন না। তিনি আমাদের বিশ্রামের ও রান্নার জায়গার বন্দোবস্ত করে দিলেন এবং বার বার ইঙ্গিতে জিজ্ঞাসা করতে লাগলেন আর কিছুর প্রয়োজন আছে কিনা।

কাওয়াসজী পরিবারকেও ভদ্রলোক তাঁর বাড়ীতে বিশ্রামের জন্য থাকতে অনুরোধ করেন, কিন্তু তাঁরা তক্ষুনি যাবার সুযোগ পেয়ে বাসের সঙ্গে বন্দোবস্ত করে ফেলেন।

মিঃ মুখার্জ্জীর আহ্বানে বাহিরে এসে দেখি কাওয়াসজী

পরিবার তখন বাসে উঠে বসেছেন। আমাদের দিকে চেয়ে ম্লান হাসি হেসে সকলে বিদায় নিলেন। দীর্ঘ দিনের সুখ দুঃখের আর একদল সঙ্গীও আমাদের কাছ হতে বিদায় নিলেন, এখন রইলেন শুধু মাষ্টারমশাই। এ ব্যাপারের পর আমার মন বড় উদাস হয়ে গেল।

বহুদিন পরে আজ আরাম করে স্নান ও খাওয়া হল। এখন যাবার পালা। আমরা 'ইভাকুইজ'দের বাসে যাবার চেষ্টা করলুম না,—কারণ তার ব্যবস্থা বড় কষ্টকর। একটি মোটবাহী প্রাইভেট বাসে করে বেলা পাঁচটার সময়ে আমাদের আশ্রয়দাতার নিকট হতে সজল নয়নে বিদায় নিয়ে মণিপুরের রাজধানী "ইমফালে" রওনা হলুম।

গভীর সবুজ বনে ঢাকা পাহাড়ের ফাঁক দিয়ে আঁকা বাঁকা রাস্তা ধরে আমরা এগিয়ে চললুম।

বাসে করে আসতে আসতে ড্রাইভার জানাল যে 'ইভাকুইজ'দের জন্য ছাউনি সহর থেকে সাত মাইল দূরে চতুর্দ্দিক থেকে পাহাড়ে ঘেরা স্থানে করা হয়েছে। সেখানে ভীষণ শীত ও বৃষ্টি, আর কলেরায় বহু লোক মরছে। সহরে 'ইভাকুইজ'দের থাকার হুকুম নেই তবে ষ্টেট্ অফিসারের অনুমতি-পত্র সংগ্রহ করতে পারলে সহরে থাকা যায়। সব

শুনে মিঃ মুখাজ্জী তাঁকে ষ্টেট্ অফিসারের কাছে নিয়ে যেতে বলল।

ষ্টেট্ অফিসার বাঙ্গালী ও অত্যন্ত অমায়িক লোক। সব শুনে তিনি তৎক্ষণাৎ অনুমতি-পত্র দিলেন এবং বলে দিলেন যেন অনুমতি-পত্র রোজ বদলে নিয়ে যাই। সহরে কোথায় থাকছি তা' জেনে নিলেন।

ভারতবর্ষে কোথায় কি সুবিধা অসুবিধা তা' আমাদের প্রায় জানা নেই, আসাম সম্বন্ধে ত একেবারেই নয়। ড্রাইভারকে কোথায় ওঠা যায় জিজ্ঞাসা করতে সে আমাদের "কর বাবুর হোটেলে" এনে পৌঁছে দিল।

হোটেলটি ছোট্ট এবং মালিক অত্যন্ত ভদ্র। এই হোটেলে আরো অনেক বাঙ্গালী দেখলুম। আলাপ হবার পর তাঁরা আমাদের সব রকম সাহায্য করতে প্রতিশ্রুতি দেন।

স্নান করে খাওয়া সারতে রাত হয়ে গেল। অত্যন্ত ক্লান্তি বোধ হওয়ায় তক্ষুনি আর সহর দেখতে বেরুলুম না। ঠিক হল আগামী কাল সে কাজ সারব।

আজ ১৯শে মার্চ্চ। মিঃ মুখাজ্জী জলযোগ সেরে অন্যান্য ভদ্রলোকের সঙ্গে গল্প করতে বসল। মাষ্টারমশাই, লীনা, ধীরা, নাইডু ও আমি সহর দেখতে বেরুলুম।

প্রথমে গেলুম বর্ত্তমান রাজার বাড়ী। বাইরে থেকেই দেখলুম। বাড়ী এমন কিছুই নয়, আমাদের বাংলা দেশের সমৃদ্ধশালী জমিদার বাড়ীর মতই, তবে খুব রুচিসম্পন্ন। রাজবাড়ীর সংলগ্ন গোবিন্দজীর মন্দির ভারী সুন্দর, আবার মূর্ত্তি আরো সুন্দর—ঠিক যেন জীবন্ত মানুষ! মন্দিরের সামনেই বিরাট দালান। শুনলুম দোলের সময় রাজ-বাড়ীর সকলে সেখানে দোল খেলেন। এখনও দালানের চারিধারে রং লেগে রয়েছে দেখলুম।

আমার কাছে কিন্তু মণিপুরের বস্তুর চেয়ে মানুষ বেশী ভাল লাগল—বিশেষ করে স্ত্রীলোক। পোষাক পরিচ্ছদ এদের খুবই সাদাসিধা, একটি কাপড় বুক থেকে হাঁটু অবধি ঝুলছে আর একটি কাপড় গায়ে জড়ান। এদের মুখ বর্মীজ প্যাটার্নের, বেশ কর্ম্মঠ, চলনে জড়তা নেই আর দেখলুম এবং শুনলুম পর্দার কোন বালাই এদের মধ্যে নেই।

স্থানীয় ভদ্রলোক মিঃ সেন আমাদের রাত্রে নিমন্ত্রণ করে মণিপুরীদের দ্বারা অভিনীত 'হরিশ্চন্দ্র' থিয়েটার দেখালেন। থিয়েটার মোটামুটি হল কিন্তু তার মধ্যে মণি-পুরীদের নাচগুলি আমার কাছে অপূর্ব্ব লাগল।

ইম্‌ফালে আমাদের কিছু দিন বিশ্রাম নেবার ইচ্ছা ছিল কিন্তু স্থানীয় ভদ্রলোকেরা জানালেন যে ইম্‌ফালের অবস্থা অত্যন্ত খারাপ, যে কোনও সময়ে বম্ পড়তে পারে কাজেই আমাদের শীঘ্র এস্থান ত্যাগ করা ভাল।

আজ ২০শে মার্চ্চ। ইম্‌ফাল থেকে গরুর গাড়ী বা "ইভাকুইজদের" বাসে করে দিমাপুরে যেতে হয়। আমাদের পক্ষে ত দুটি যানই বড়ই সমস্যাজনক, কারণ দুটি যানই বড় ভীতিপ্রদ। আমাদের সে সমস্যা থেকে মুক্তি দিলেন হোটেলেরই এক বাঙ্গালী ভদ্রলোক। তাঁর অধীনস্থ লরী মাল নিয়ে সর্ব্বদা দিমাপুরে যায়। সেই লরীতে মালের সঙ্গে তিনি আমাদের যাবার বন্দোবস্ত করে দিলেন। আমরা সকাল বেলা জলযোগ সেরে ও দুপুরের খাবার সঙ্গে নিয়ে লরী করে দিমাপুরের দিকে রওনা হলুম।

বিচিত্র গঠনের সবুজ পাহাড়ের গা ঘেঁসে আবার আমরা এগিয়ে চললুম। গত রাত্রি থেকে বৃষ্টি সুরু হয়েছে ও তা এখনও গুঁড়ি গুঁড়ি পড়ছে। এখানে প্রচুর বৃষ্টি হয় বলে পাহাড়ের গায়ে অত্যন্ত ঘন ও সতেজ বন। পাহাড়ী রাস্তা অত্যন্ত বিপদজনক। একদিকে তার উঁচু পাহাড় আর একদিকে অতলস্পর্শী গহ্বর। গাড়ী খুব

সাবধানে চালাতে হচ্ছে, একবার একটু এদিক ওদিক হলেই তা' গহ্বরের গর্ভে লীন হয়ে যাবে। অনেক লরীর ধ্বংসা-বশেষ গহ্বরে দেখলুম।

আজ সকাল থেকে সূর্য্যের মুখ আর দেখতে পেলুম না। আকাশ সর্ব্বদাই মেঘাচ্ছন্ন। কখন কখন তা' আবার অন্ধকার মূর্ত্তি ধারণ করেছে। প্রচুর বৃষ্টির জন্যই বোধ হয় এখানের পাহাড়ে ঝর্ণার অভাব নেই।

দুপুরে একটি ঝর্ণার ধারে বসে সঙ্গে আনা খাবারের সদ্‌ব্যবহার করলুম। পাহাড় কেটে কেমন করে সুন্দর রাস্তা তৈরী হয় এখানে তা' দেখবার সুযোগ পেলুম। ইম্‌ফালেও সুন্দর রাস্তা তৈরী হচ্ছে দেখে এসেছি। যুদ্ধের জন্য ইম্‌ফাল এখন অত্যন্ত কর্ম্মচঞ্চল।

সন্ধ্যাবেলা আমরা দিমাপুর ষ্টেশনে এলুম। ষ্টেশনের বাইরে থেমেই লোকে লোকারণ্য আর তেমনি কোলাহল। আমরা যে ট্রেণে যাব তা' রাত দশটার সময়ে ছাড়ে, কাজেই ওয়েটিং রুমের আশ্রয় নিলুম।

এখানে এসে শুনলুম ট্রেণের প্রথম ও দ্বিতীয় শ্রেণীর কামরা নাকি শুধু ইউরোপীয়ান ও অ্যাংলো ইণ্ডিয়ানদের জন্য রিজার্ভ রাখা হয়েছে; তা'ছাড়া যুদ্ধের জন্য ট্রেণের

প্রয়োজন বৃদ্ধি হওয়ায় ও সুবন্দোবস্ত না থাকার জন্য "ইভাকুইজ'দের এই ভিড়। বহু কষ্টে টিকিট যোগাড় করে ও তারও চেয়ে বেশী কষ্টে একজন বাঙ্গালী রেলকর্ম্মচারীর সাহায্যে আমরা রাত দশটার সময়ে ট্রেণে উঠলুম। এখনও ঝিম্ ঝিম্ করে বৃষ্টি পড়ছে।

গাড়ীতে অন্ধকার, অত্যন্ত ভিড় ও অপরিচ্ছন্নতার মধ্যে অবর্ণনীয় কষ্ট ভোগ করে রাত কাটালুম।

আজ ২১শে মার্চ্চ। ট্রেণ থেকে গ্রাম সহর ও তথাকার জীবনযাত্রা দেখতে দেখতে দুপুরে 'পাণ্ডুতে' এসে পৌঁছলুম। এখানে ষ্টেশন থেকে কিছু দূরে বাঙ্গালীদের একটি মেস আছে। আমরা 'ইভাকুইজ' শুনে তাঁরা আদর করে আমাদের মেসে নিয়ে গেলেন।

পাণ্ডু থেকে ব্রহ্মপুত্র নদী পার হয়ে আমাদের এখন ওপারে যেতে হবে ও সেখান থেকে 'আমিন গাঁ' ষ্টেশনে গিয়ে ট্রেণ ধরতে হবে। মিঃ মুখাজ্জী ও মাষ্টারমশাই জলযোগ সেরে মেসের ভদ্রলোকদের সঙ্গে নদীর ধারে ফেরী বা নৌকার বন্দোবস্ত করতে গেলেন।

খানিক পরে ফিরে এসে মিঃ মুখাজ্জী খবর দিল যে, গৌহাটী কলেজের তৎকালীন প্রিন্সিপ্যাল মিঃ চ্যাটাজ্জীর

বড় ছেলে দেবব্রত চ্যাটার্জ্জী, যাঁর সঙ্গে বর্মায় আমাদের বন্ধুত্ব হয়, তিনি দিন কয়েক আগে বর্মা থেকে গৌহাটী ফিরে এসেছেন। তাঁদের ওখানে গিয়ে দুদিন বিশ্রাম নিলে কেমন হয় জিজ্ঞাসা করলে আমি তৎক্ষণাৎ রাজি হয়ে গেলুম।

আমাদের জিনিষপত্রগুলি মেসের ভদ্রলোকদের জিম্মায় রেখে তক্ষুনি আমরা কয়জন রওনা হলুম ও সন্ধ্যাবেলা গৌহাটীতে তাঁদের বাড়ী এসে পৌঁছলুম। তাঁরা ত অত্যন্ত আদরের সঙ্গে আমাদের গ্রহণ করলেন এবং একেবারে গৌহাটীতে না এসে পাণ্ডুতে নামার জন্য সস্নেহ তিরস্কারে অভিষিক্ত করলেন। সেদিন রাত্রে আমরা তাঁদের হাঁটা পথের গল্প শোনালুম ও বিশ্রাম নিলুম।

২২শে মার্চ্চ। সকাল বেলাতেও বিশ্রাম নিয়ে বিকাল বেলা ব্রহ্মপুত্র নদীর মাঝে ছোট্ট একটি পাহাড়ের উপর উমানন্দের মন্দির দেখতে যাওয়া হল। ব্রহ্মপুত্র নদী এখানে বড় সরু হয়ে গেছে, যতদূর দৃষ্টি যায় কেবল সাদা বালির চড়া। চড়া ভেঙ্গে আমরা নৌকা ধরলুম। নৌকা থেকে উমানন্দের মন্দির দেখতে ভারী সুন্দর।

উমানন্দের মন্দির দেখে এসে আমরা প্রিন্সিপ্যাল

চ্যাটার্জ্জীর সঙ্গে গৌহাটী সহর দেখতে বেরুলুম। প্রিন্সিপ্যাল চ্যাটার্জ্জী রাস্তায় যে কোন চেনাশোনা লোক দেখেন থামিয়ে আমাদের দেখিয়ে বলেন, "জান এরা বর্মা থেকে পায়ে হেঁটে পাহাড় পার হয়ে এখানে এসেছেন। শোন একবার আশ্চর্য্য কাণ্ড!"

২৩শে মার্চ্চ। সকাল বেলা আমরা কামাখ্যা মন্দির দেখতে গেলুম। হেলায় এত পাহাড় ডিঙিয়ে এলুম আর আজ পাথরের সিঁড়ি ভেঙ্গে কামাখ্যা মন্দিরে উঠতে আমি হাঁপিয়ে ও আছাড় খেয়ে অস্থির। কামাখ্যা মন্দিরের বহু গল্প শুনে আমার তার সম্বন্ধে খুব আগ্রহ ছিল। কিন্তু দেখে নিরাশ হলুম। এর চেয়ে আমার কাছে ইম্‌ফালের গোবিন্দজীর মন্দির ঢের ভাল বোধ হল। এর চেয়ে সে মন্দির অনেক বেশী সুন্দর, অনেক বেশী পরিষ্কার ও তার আবহাওয়া এর চেয়ে অনেকগুণে ভাল।

মন্দির থেকে ফিরে এসে দুপুরের খাওয়া সেরে চ্যাটার্জ্জী পরিবারের স্নেহ-প্রীতির আবেষ্টনী হতে বিদায় নিয়ে বিকাল চারটের সময়ে আবার পাণ্ডুর উদ্দেশ্যে রওনা হলুম।

পাণ্ডুতে এসে দেখি ফেরী চলে গেছে। তাড়াতাড়ি

নৌকার বন্দোবস্ত করে আমরা পাণ্ডু ত্যাগ করলুম। আমিন-গাঁ এসে ন'টার ট্রেণ ধরতে আমাদের অসুবিধা হয় নি ও ট্রেণেও আমাদের কোন অসুবিধা ভোগ করতে হয় নি।

২৪শে মার্চ্চ। বর্মা থেকে আজ হতে ঠিক একমাস আগে ২৪শে ফেব্রুয়ারী রাত্রি বেলা আমরা ভারতের উদ্দেশ্যে যাত্রা করেছিলুম। সে দিন আর আজকের এদিম কতও তফাৎ। এক মুহূর্ত্তে এই দীর্গ এক মাসের সুখদুঃখ মাখান ছবি আমার চোখের সামনে ভেসে উঠল।

গাড়ীতে বসে দু'ধারের দৃশ্য দেখতে দেখতে ও পথের গল্প করতে করতে এক সময়ে রাণাঘাটে এসে পেঁছিলুম। দুর্গম পথে আমাদের পরম বন্ধু ও সঙ্গী মাষ্টারমশাই এখানে বিদায় নিলেন।

গাড়ী যতই কোলকাতার দিকে এগিয়ে চলেছে ততই গরম ও গোলমাল বৃদ্ধি পাচ্ছে। টেণে যত লোক উঠছে আর নামছে সবায়ের আমাদের লক্ষ্য করে এক প্রশ্ন "কেমন পথ? কি করে এলেন? খুব কষ্ট হয়েছে?" ইত্যাদি ইত্যাদি। আমি ত গরম ও গোলমালে ক্লান্ত হয়ে একেবারে বিছানা নিলুম। গাড়ীতে একজন এম, এল-এর সঙ্গে দেখা হল। তিনি মিঃ মুখার্জ্জীর কাছ থেকে সব ঘটনা শুনে সে বিষয়ে

সেণ্ট্রাল আসেম্‌ব্লিতে আলোচনা করবার জন্য তা' সংক্ষেপে লিপিবদ্ধ করে নিলেন।

বিকাল বেলা ট্রেণ শেয়ালদা ষ্টেশনে এসে থামতেই শুনতে পেলুম হিন্দীতে কয়েকজন লোক বলছেন, "বর্মা ও রেঙ্গুন থেকে যে সব ভাই বোনেরা এসেছেন তাঁরা ষ্টেশনে এসে দাঁড়ান।" টেণের ভদ্রলোকেরা আমাদের দেখিয়ে দিলেন। খোঁজ নিয়ে জানলুম এঁরা ইভাকুইজদের জন্য খাবার ও তাদের বিনা খরচে গন্তব্য স্থানে যাবার ব্যবস্থা করে দেন। আমরা তাঁদের ধন্যবাদ জানিয়ে ষ্টেশন ত্যাগ করলুম।

যখন রাজপথে এসে দাঁড়ালুম তখন অস্তমান সূর্য্য প্রাসাদশিখরগুলিতে তাঁর স্নিগ্ধ, শুদ্ধ, রক্তাভ আলোর পরশ বুলচ্ছেন।

আমাদের পথ চলা শেষ হল।

সমাপ্ত